গল্পবিশ্ব

পঞ্চম সংখ্যা

২০০৭

ত্রিশ টাকা

গল্পবিশ্ব

গল্প এবং গল্প সংক্রান্ত পত্রিকা

গল্পবিশ্ব

গল্প এবং গল্প সংক্রান্ত পত্রিকা

পঞ্চম সংখ্যা আগস্ট ২০০৭
শ্রাবণ ১৪১৪

সম্পাদক
অলোক গোস্বামী

প্রচ্ছদ
সুদীপ্ত রায়

অক্ষর বিন্যাস
এ বি সি প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স
নেতাজি পল্লী, রবীন্দ্র সরণি, শিলিগুড়ি
পশ্চিমবঙ্গ ।২৫৯৯৭৮৪

যোগাযোগ
২০, আশুতোষ মুখার্জি রোড
কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ৪০১
ফোন নং : (০৩৫৩) ২৪৩ ৫৩৯৭
৯৪৩৪১ ৯৬৬২২

মূল্য
ত্রিশ টাকা

সূচি

সম্পাদকীয় ০৫

আলোচনা

বাংলাদেশের সমকালীন সাহিত্যের প্রবণতা
সৈয়দ মনজরুল ইসলাম ০৭
গল্পের আনুমানিক ভাবনা
প্রবালকুমার বসু ১৬
যা পাচ্ছি এখন দিনে, সেই যেন পাই শেষে
শুভংকর গুহ ২১

গল্প

বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ
সমীর রায়চৌধুরী ২৭
মাছিদের কোনও শ্রেণীশত্রু নেই
সাধন চট্টোপাধ্যায় ৩২
পুত্রবধপালা
কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর ৪০
তর্জনী
বিজিত ঘোষ ৪৯
নদীর কাছে
নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৫৭
যুদ্ধ শেষ
শিখর রায় ৬৬
বড় কাছে বড় দূরে
তাপস গুহবিশ্বাস ৭৬

দায়বদ্ধতা
শীর্ষেন্দু দত্ত ৮১
আততায়ী যখন ছায়া
অশোক অধিকারী ৮৫
আঘাত
নকুল মণ্ডল ৯০
মহড়া
শরদিন্দু সাহা ১০৫
আমাদের বাবুর তালুকে গাজন
বাসব দাশগুপ্ত ১১৯
কন্দর্প
প্রবুদ্ধ মিত্র ১২৭
নামাবলি
অলোক গোস্বামী ১৩৩

ক্রোড়পত্র ১৪৫

অনুপস্থিতির শিল্প
দেবেশ রায় ১৪৭
দৃশ্যমান অন্তরাল
সুধীর চক্রবর্তী ১৪৯
'ঠাকুমার তালপাখা' ও একটি নিবিড় পাঠ
সাধন চট্টোপাধ্যায় ১৫৭
কাছের কথাকার
অজিতেশ ভট্টাচার্য ১৬০
পীযূষ ভট্টাচার্যের মনোগ্রাহী, হৃদয়স্পর্শী দশটি গল্প
ড. বিজিত ঘোষ ১৬৭
সংকট ও সংকটমোচনের আখ্যান : প্রসঙ্গ পীযূষ ভট্টাচার্য
রমাপ্রসাদ নাগ ১৭১
বাংলা ছোটগল্প : একটি প্রস্তাব
দিলীপ কুমার ও বসু অমিতাভ গুপ্ত ১৮০
স্বপ্নের অন্ধকার ও একটি যাদুর তালপাখা
রাজীব চৌধুরী ১৮৬
পীযূষ ভট্টাচার্য, তাঁর বহুতর বাস্তব
সন্দীপ মুখোপাধ্যায় ১৯৩
ভিন্ন ধারার কথক পীযূষ ভট্টাচার্য
নিত্যানন্দ ঘোষ ২০২
মুক্তির ভঙ্গিমা ও পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্প
তাপস রায় ২০৭
পীযূষ ভট্টচার্যের গল্প : কাব্যিক সম্মোহন
অরুণাংশু ভট্টাচার্য ২১১
কীর্তিমুখ
অভিজিৎ করগুপ্ত ২১৫
কীর্তিমুখ
নাট্যরূপ : শবর রায় ২১৭

পীযূষ ভট্টাচার্যর সাক্ষাৎকার ২৩০

স্বজনেষু,

পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশে খানিক বিলম্ব হল। এই ত্রুটি ইচ্ছাকৃত। নিয়মিত প্রকাশিত ঢাউস সাইজের অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিন দেখে-পড়ে খানিক বিবমিষা জেগেছিল। মনে হয়েছিল, গল্পবিশ্বও কি পাঠকরুচি নামক কোনও অলৌকিকতার সামনে নতজানু হয়ে বলছে, যা লাগবে বলবেন স্যার?

অথচ লিটল ম্যাগাজিন : –

(১) কারও আঁতুড়ঘর নয়।

(২) দিবে আর নিবে, তত্ত্বের আশ্রয়দাতা নয়।

(৩) কোনও সমান্তরাল সাহিত্যধারা নয়।

(৪) করে-কম্মে খাওয়ার প্ল্যাটফর্ম নয়।

এরকম আরও কিছু বিশ্বাসকে আদর্শ করে গল্পবিশ্ব-র জন্ম। এই আদর্শগুলো থেকে সামান্য বিচ্যুতি যেহেতু মৃত্যুরই নামান্তর, তাই পত্রিকা প্রকাশে উৎসাহী হইনি।

কিন্তু এমন কিছু পাঠক আছেন যাঁরা নিজস্ব জ্ঞানবুদ্ধির মাপসই লিটল ম্যাগাজিন খোঁজেন না, খোঁজ করেন সেইসব লিটল ম্যাগাজিনের যাদের মারফৎ নিজস্ব চিন্তা-চেতনার পরিধিকে ব্যাপ্ত করা যায়। এঁদের আগ্রহেই গল্পবিশ্ব-র এই সংখ্যা।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, নিজস্ব আবেগ এবং অভিমানকে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে আমরা ওঁদের অবহেলা করেছিলাম।

আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

গল্পবিশ্বের সাম্প্রতিকতম চিত্রটিকে তুলে ধরতে যেহেতু আমরা দায়বদ্ধ তাই এই সংখ্যায় কিছু প্রবন্ধ এবং গল্পের পাশাপাশি প্রচারের ন্যাবা রঙা আলো থেকে বরাবর সম্মানজনক দূরত্বে থাকা গদ্যকার পীযূষ ভট্টাচার্যর রচনা সম্পর্কিত কিছু মতামত এবং আলোচনা প্রকাশ করা হল।

প্রকাশ করা হল বাংলাদেশের দুটো রচনা। এই রচনাদুটোর জন্য আমরা শ্রীমতি শাহানা আখতার মহুয়ার (সম্পাদক : ছান্দস) কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম।

ধন্যবাদ।

ক্রোড়পত্র

পীযূষ ভট্টাচার্য

একনজরে পীযূষ ভট্টাচার্য

জন্ম : ৩, ১২, ১৯৪৬
শিক্ষা : বি এ পার্ট ওয়ান (প্রাইভেট)
পেশা : পি ডব্লু ডি-তে চতুর্থ শ্রেণী থেকে শুরু করে করণিক হয়ে অবসৃত ১৯৭০ সালের ১৭ এপ্রিল
সন্তান-সন্ততি : দুই মেয়ে

প্রকাশিত বইয়ের তালিকা

মহিন্ন অসুখ মহিন্ন যন্ত্রণা	কবিতা	১৯৯১	একুশে	কলকাতা
কুশপুত্তলিকা গল্প	সংকলন	১৯৯৫	রক্তকরবী	কলকাতা
পীযূষ ভট্টাচার্যর গল্প	গল্প সংকলন	১৯৯৮	রক্তকরবী	কলকাতা
জীবিসঞ্চার	উপন্যাসিকা	২০০১	রক্তকরবী	কলকাতা
কীর্তিমুখ	গল্প সংকলন	২০০১	নয়া উদ্যোগ	কলকাতা
নিরক্ষরেখার বাইরে	উপন্যাস সহ ছোটগল্প	২০০২	প্রমা	কলকাতা
পদযাত্রায় একজন	গল্প সংকলন	২০০৪	নয়া উদ্যোগ	কলকাতা
নির্বাচিত গল্প	গল্প সংকলন	২০০৪	দীপ প্রকাশন	কলকাতা
ঠাকুমার তালপাখা ও অন্যান্য গল্প	গল্প সংকলন	২০০৬	নয়া উদ্যোগ	কলকাতা

অনুপস্থিতির শিল্প

দেবেশ রায়

পাঠক হিসেবে প্রবীণতা দাবি করতে পারি। কবে যে পড়তাম না, ভুলে গেছি। মফস্বলের ছেলে বলেই হয়ত এমন অভ্যেস তৈরি হতে পেরেছে। যার কিছুই করার নেই সে অন্তত বই পড়তে পারে। আমি কোনও দিন পুতুলও খেলিনি। পড়া ছাড়া আমার কোনও গতি ছিল না।

যাঁরা কুকুর পোষেন, তাঁদের কাছে শুনেছি, বাড়ির সকলের শরীরে কুকুরের গায়ের গন্ধ গোপনে ছড়িয়ে থাকে। সে গন্ধ কোনও মানুষ পান না কিন্তু আর একটা কুকুর ঠিক পায়। সেই গন্ধ পেয়ে গেলে কুকুর আর তাকে আক্রমণ করে না।

বছরের পর বছর শুধুই পড়ে গেলে হয়ত কুকুরের মতো অলৌকিক ঘ্রাণক্ষমতা তৈরি হয়। এক ঝলকেই গন্ধ আসে, কোনও একটি লেখা আমার খাদ্য কি না, বা, রাস্তায় শুয়ে থাকলেও ধেয়ে আসা ট্রাক থেকে বাঁচার চেষ্টা নেই, অথচ যে দোকানের আশপাশে অষ্টপ্রহর ঘোরাঘুরি তার বাচ্চা ছেলেটির ধমকেই কেঁউ কেঁউ করে পালিয়ে যাওয়ার ন্যাকামি দিব্বি আছে।

পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পে সে ভাবেই গন্ধ পেয়েছিলাম। পীযূষের লেখাটাই তেমন, গন্ধ পেলে তো পেলে, না পেলে পেলে না। গল্পে পীযূষ নিজের কোনও বাজখাঁই উপস্থিতি তৈরি করেন না। ভয়ঙ্কর ঘটনা অনেক সময় থাকতে পারে–কিন্তু পীযূষের গল্পে তেমন ভয়ঙ্করতা ঘটে না। কখনও স্মৃতিতে, কখনও ভাবনায়, সেই ভয়ঙ্করের ওপর মিহি কুয়াশা ছড়িয়ে থাকে। এটা যদি দুটো-একটা গল্পেই ঘটত, তা হলে এই গুণটিকে তার কুশলতা মনে হতে পারত। এমন কুশলতাও ঈর্ষণীয়। পীযূষ তেমন কুশলতার চাইতে বড় লেখক।

আমার কথাটার উদাহরণ হিসেবে নয়, কথাটা নিজেই স্পষ্ট বুঝে নিতে পীযূষের গল্পের এই মিহি কুয়াশার বুনট দুটো-একটা পরীক্ষা করা যায়। 'কিন্তু আর এক সংলাপের কাছে পৌঁছানোর জন্য একটি ভোরের অপেক্ষায় থাকতে হত! তা না হলে এই আতঙ্কগ্রস্ত নীরবতা প্রাকৃতিক মনে হয়ে যেত এতদিনে।' (বোধনপর্ব)

এটা এই গল্পটির শুরু। গল্পটি তারপর গঠন পায় বেশিরভাগই কথনে, ঘটনায় নয়। বামুনবাড়ির ছেলে কমিউনিস্ট হয়েছে, এখন মন্ত্রীও হয়েছে। তার ভোটারদের তারই ভোটার

রাখতে যে সব স্থানিক ব্যবহার, সরবতা ও নীরবতা দরকার, সে সবই তার আয়ত্তে। শুকিয়ে যাওয়া নদী আত্রেয়ীর চরে নতুন সেচপ্রকল্প চালু ও অচালু করার সূত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ, গেজেটিয়ারে আত্রেয়ীর জলপ্রবাহ নিয়ে সেই শ-দুই বছর আগের সংকট–এ সব এসেছে। কিন্তু এই ইতিহাস ও বাস্তব গিয়ে মিশেছে ঐ জায়গার এক রাজবংশী মোখা নর্তকের গল্পের সঙ্গে। সেই এককালের মোখা নর্তক, মোখার পোশাকে চৌদ্দ হাত কালীকে আরও প্রায় সাড়ে ছ-ফুট বাড়িয়ে অলৌকিকতা–রচনাকার। একদিনের।

পীযূষের গল্পটা এখানে আমি বলে দিতে চাইছি না। আমি শুধু জানাতে চাই–গন্ধটা পেয়েছিলাম কেন। এ গল্পটিতে খুব পরিষ্কার তিনটি বিভাজন আছে। সেই একটি কোনও বিভাজন নিয়ে বেশ ভাল একটি ছ-ঘন্টা আট ঘন্টার ছোট উপন্যাস হতে পারত। একটি বিভাজন আত্রেয়ীর ইতিহাস ও বর্তমান। আর এক বিভাজন–সত্যসুন্দর ও বিকাশের একই রাজনীতির অন্তর্গত থেকে বিপরীতমুখী যাত্রা। আর একটি বিভাজন সেই রাজবংশী মোখা নর্তক বাঙ্কাকে নিয়ে। এমন আখ্যান নিয়ে আজকাল উপন্যাস লেখা হচ্ছে ও তার ফলে বাংলা গল্প-উপন্যাসের বিস্তার ঘটছে। এমনকী, মুখ্যত এই তিনটি বিভাজন ও আরও উপবিভাজন ঘটিয়ে একটি অখণ্ড উপন্যাসও তৈরি হতে পারত। তেমন উপন্যাসও লেখা হচ্ছে। আকারে বড় উপন্যাস লেখার তাকতই আলাদা।

গল্প-উপন্যাসের প্রচলনকে এড়িয়ে ও প্রত্যক্ষ তাকতের প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও পীযূষ গল্পটাকে নিয়ে গেল সেই মোখা নর্তকের দিকে। লোকমেলায় সে এসেছে তার প্রাচীন সেই নাচের ছবি টাঙানো থাকবে–শুনে। 'হাতড়াতে হাতড়াতে সে তার নিজের শক্ত পায়ের গোছা, পরিশ্রমী দুটো হাত, তার রক্তবাহী ধমনিই প্রমাণ করে তার নিজের কাছে–এ ছবি বাংকার।'

বহুৎ খুব! রূপক যে এমন অনায়াসে তৈরি হয়ে গেল সে শুধু পীযূষের অনুপস্থিতির শিল্পে।

এর গন্ধ যদি না চিনে থাকতাম, তাহলে তো পাঠকের অহংকার থাকত কোথায়?■

দৃশ্যমান অন্তরাল

সুধীর চক্রবর্তী

আধুনিকোত্তর কালে বিশ্বের সব চেতনাসম্পন্ন দেশেই সাহিত্যের ধারা ও অভিমুখ খাত বদল করেছে। লেখকদের কাজ আর 'যেমন দেখি তেমনি লিখি' কিংবা ভাবী স্বপ্নের কল্পিত আখ্যানে আটকে থাকে না। লেখক হয়ে ওঠেন একজন আর্ত মানুষ, যিনি সময়হারা হয়েও সময়চিহ্নিত। অথচ ঠিক কালের পুতুল নন। এমনকী পাঠকদের বিনোদনকল্পে তাঁর লেখনী ধারণ নয় তাই প্রত্যাশিত ছকে বৃত্তধর্মী গল্প লিখে তাঁদের ইচ্ছাপূরণের চেয়ে লেখক চাইছেন নিজেকে জানতে। নিজের পরিচিত পরিবেশে, দেশ কাল মানুষ মাটির সংযোগে, আবার একই সঙ্গে তার থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে স্বদৃষ্ট কোনও চেতনালোকে বা জাদুবিশ্বে। আখ্যানের ভাষা তাই প্রবহমান ভাষার সমান্তরালে তৈরি করে এক আপন বয়ান, যাতে অতীতের সঙ্গে বর্তমান ছুঁয়ে ভবিষ্যতের সঙ্গে ঊর্ধ্বাধঃ সম্পর্কসম্পন্ন এক আবছা ভাষা গড়ে ওঠে, যার তত কিছু দায় নেই পাঠকের বোধগম্য হবার। এক্ষেত্রে লেখক বরং পাঠককে ভাবেন কিছুটা মেধাবী ও পরাবাস্তবতার সন্ধানীরূপে। তাই পদে পদে তাঁকে যুক্তিক্রম, নিটোল গল্পবোনা, চরিত্রের বিকাশ বা নিসর্গ বর্ণনার বদলে নজর রাখতে হয় আত্মতার দিকে বা আত্মনির্মাণের দিকে। কমলকুমার মজুমদার, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বা সুবিমল মিশ্রদের পড়তে পাঠকদের পক্ষ থেকে একটা আলাদা প্রস্তুতি লাগে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর জীবিতকালে নিজের মতো করে বেশ কিছু গল্প-উপন্যাস লিখে বাক্সবন্দি করে রেখেছিলেন, ছাপেননি। বোধহয় বুঝেছিলেন সেই সময়ে তাঁর রচনারীতি বা রচনার বিষয় অনুধাবন করবার মতো পাঠকবৃত্ত প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি। পরে, তাঁর প্রয়াণের বেশ ক'বছর পরে, আবিষ্কৃত হয় তাঁর ঐসব স্বেচ্ছা অন্তরিত রচনা, যা পরবর্তী সময়ের পাঠক (সকলে নয়, কেউ কেউ) খুঁজে খুঁজে পড়ছেন, খুঁড়ে খুঁড়ে যেন স্বতঃস্ফুট হয়ে উঠছে অন্যরকম আলোসম্পাতের মহিমা–অন্তর্বিশ্ব। আমাদের গল্প কথনের একটা অন্য রকম গহন রূপ যেন এবারে প্রতিভাত হচ্ছে–যা অনচ্ছ অথচ দুরূহের দারুণ আকর্ষণে প্রচ্ছন্ন টানে আমাদের ভাসায় ও ভাবায়।

পীযূষ ভট্টাচার্য গল্প লেখক রূপে খুব যে বিজ্ঞাপিত বা আলোচিত নন, সে তো সবাই জানেন। তাঁর বইগুলিও সুপ্রাপ্য নয়। থাকেনও অভিমানী দূরত্বে সেই বালুরঘাটের উত্তরাস্যাং দিশি। কিন্তু আমার মতো জাগ্রত পাঠক, খানিকটা যেন শিক্ষিত হবার ঝোঁকে, তাঁকে

পড়তে থাকি, পড়তেই থাকি, ঘোরের মধ্যে। অথচ জানি পীযূষের গল্পে কোনও বস্তুগত টান নেই, চরিত্রগুলির পরম্পরা ধূসর, পরিণতিহীন সম্পর্কের কিংবা মগ্ন মানবের কিছু উদ্ভাস শেষ পর্যন্ত পাঠকের জন্য বরাদ্দ। তাই সই, বুঝতে পারি ব্যতিক্রমী এই লেখক নিজের জন্যই গল্প লেখেন, নিজেকেই বুঝতে খণ্ডশ সত্তায়। কিন্তু পাঠকদের জন্য রাখেন এক পরিসর, ভাবনার পরিসর–যা পাঠককে এগিয়ে দেবে লেখকের লক্ষ্যের অভিমুখে। শুরু হবে এক নতুন ডিসকোর্স, নতুন ভাষায় ও চিহ্নকের দৌত্যে। গঙ্গ-পদ্মা-মেঘনা বিধৌত বঙ্গ সাহিত্যে আত্রাই-পুনর্ভবা-টাঙ্গন যেমন নবধারা জলের বর্ণগন্ধে নতুন, পীযূষের গল্পের অবস্থান তেমনই নিসর্গ সম্ভব, অপিচ ইতিহাসের স্মৃতিগন্ধা আর লোকায়তের স্বেদজ স্বপ্নে আকীর্ণ। তাঁর বর্ণনায় আকাশ কলকাতার মতো লম্বা, চৌকো, নানা কিসিমের ফ্রেম বাঁধানো নয়–বিরাট আকাশ খোলা। তেমনই তাঁর অনুভবে তিনটি নদীর ত্রিবেণী রূপসা। তার যেমন চলে যাওয়া আছে, মজে যাওয়াও আছে। সেই সঙ্গে আছে উত্তরবঙ্গের নিজস্ব ঋতুবদলের পবিত্রমূর্তি। পীযূষের বর্ণনায়–'তরাইয়ের মেঘ গলিত ধাতুর মতো সগর্জন নেমে প্রতিমা ছাঁচে স্বর্ণমূর্তি হয়ে যায় হেমন্ত। পর্ণমোচী বৃক্ষের পাতা ঝরে পড়তেই মনে হয়, পরিযায়ী পাখিদের আসবার সময় হয়ে গেছে। ...লেখাও এভাবেই হয়। এভাবেই পৌঁছাতে চাই শিকড়ে। সব জীবনই তো দুঃখের। ভালোবাসাও দুঃখেরই। বলা যেতে পারে এ সত্যিকারের বেঁচে থাকার দুঃখ। পরজন্ম নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। কেননা এজন্মেই তো বার বার করে জন্ম নিতে হচ্ছে।'

জীবনানন্দ দাশ কবিতায় পরাআধুনিকতার বয়ানে আশ্চর্য সব পংক্তি লিখে গেছেন, যেমন 'আকাশের ওপারে আকাশ'। তার মানে দৃশ্যের বাইরে পাঠক স্রষ্টার মানসলোকে ভাবা এক অদৃশ্য আকাশ–হয়ত স্রষ্টা নিজেও তা ভাবেননি, কবি তাঁকে ভাবালেন এই প্রথম। শিক্ষিত শহরবাসী চোখখোলা মানুষ যা বোঝেন না, গ্রামের লোক তা বোঝেন, কারণ জীবন তাঁদের প্রত্যক্ষ স্পর্শাতুর সান্নিধ্যে কবোষ্ণ। 'তীর ছাপি নদী কলকল্লোলে এলো পল্লীর কাছে রে'–এ বর্ণনা রবীন্দ্রনাথেরই লেখা, তবে জোড়াসাঁকোর রবীন্দ্রনাথ নন, পদ্মা ঘোরা নদী দেখা এই রবীন্দ্রনাথ। গ্রামের লোক একবার আমাকে বলেছিলেন, 'জল এবারে যে পর্যন্ত এসেছে ঠিক আছে, তবে সামনে পূর্ণিমে, সেই সঙ্গে যদি ওপর বৃষ্টি হয় তবে ব্যানবন্যা ঠেকানো যাবে না'। এখানে 'ওপর বৃষ্টি' মানে কোনও অদৃশ্য মেঘপুঞ্জের ক্ষরণ–আকাশের ও পারের আকাশ থেকে। জীবনানন্দের এরকম এক উক্তি হল : 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়।' এরই পিঠোপিঠি কথা হল : 'আমরা যাইনি মরে আজও–তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়।' তার মানে বেঁচেই আছি এবং / অথচ আমাদের অদৃশ্যে তৈরি হচ্ছে কতই না দৃশ্য। সে দৃশ্য অবশ্য মূলত অদৃশ্য।

এ ধরনের ধরতাই না করলে পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পের সূচনাবিন্দু ধরা যাবে না। যেমন ধরা যাক তাঁর 'ক্ষরণ' গল্পের প্রথম ক'টি পংক্তি :

> রঙ জ্বলে যাবার আশংকায় রীতা শাড়িটি ছাদের একপাশের ছায়ায় মেলে। গত রাতে চাঁদের চারিদিকে পুকুর দেখে সে ঠিক আঁচ করতে

> পেরেছিল, আজ রোদ হবে। হাতের আড় ভেঙে মেঘের গতিবিধি লক্ষ করে রীতা যখন শাড়িটির দিকে তাকিয়ে দেখে, শাড়ির রঙ নকশায় কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যায়, কেননা রোদ্দুরের ভারে অবনত আকাশ নেমে এসেছিল চোখে।

এখানে রোদ, ছায়া, চাঁদের চারপাশের পুকুর, মেঘের গতিবিধি সবই নিসর্গের অংশ, তবে প্রাকৃতিক অর্থে নয়, মনের মানসে নির্মিত বয়ান। যে দেখেছে সে দৃশ্যত রীতা, অন্তরালে লেখকই দ্রষ্টা। পাঠককে তাই সাবধানে পা ফেলতে হবে পীযূষের আখ্যানের জগতে পৌঁছতে, আসলে যা গল্পহীন কিন্তু অনুভূতিদেশের আলোয় অন্তর্দীপ্ত।

লেখকের চতুর কলম যেমন সাঁটে কথা বলতে জানে তেমনই মায়া রোদ্দুরের পরিশীলিত ভাষা তার মধ্যে রঙের পরশ আনে। 'পটগাথা' নামের গল্প শুরু হচ্ছে :

> হঠাৎ একটি পাখি ডেকে উঠলে নিসর্গবোধ তৈরি হয় না–একটু অন্যরকম লাগে। এই অন্য রকম লাগা নিয়েই এই গল্প।

'কোরবানী' গল্পের ধরতাই :

> মৃত্যুর মুহূর্তে পৌঁছে যেন জীবন জীবন হয়ে উঠেছে। মৃত্যুকে তো বোঝা যায় না। মেনে নিতে হয়।

'নির্বাচিত গল্প' (প্রকাশক : দীপ প্রকাশন) সংকলনের 'ভূমিকার পরিবর্তে' অংশে লেখকের জবানীতে জানা যাচ্ছে, ১৯৪৬-এ তাঁর জন্ম বালুরঘাটে, মামার বাড়িতে। কলকাতার চিৎপুরের থ্রি বাই এফ ব্রজকুমার শেঠ লেন থেকে দেশের বাড়ি রংপুর নীলফামারি, সেও এক উত্তরবঙ্গে, চলে আসতে হয়েছিল। সেখান থেকে বালুরঘাট। জায়গাটি কেমন? পীযূষ তাঁর নিজস্ব ঢঙে জানিয়েছেন : 'সে এক অন্য দেশ, তামাক পাতার ওপর জল শিশিরের আয়নাতে মুখ দেখা, নাম লিখে রাখা।'

ব্যস। পাঠক বুঝে ফেলবেন লেখককে, নাকি কথককে? বুঝবেন যে, এর চেতনা পরিপার্শ্ব আর ভাবনায় কোথাও গাঙ্গেয় স্পর্শ নেই, নেই বঙ্গীয় লেখককুলের অনপনেয় কলকাতা মুখিনতা। সেটা স্বস্তির কথা। নীলফামারি আর বালুরঘাটে লালিত একজন সংবেদী কথাকার তাঁর মতো বোধভাষ্য রচনা করে যে সব আখ্যান সামনে এনেছেন তার অন্তঃপটে অনেক ভিন্নতর যাপন, লোকাচারের স্মৃতি, জলীয়তা আর বাতাসের শুশ্রূষা। তেমনই তাঁর প্রকাশের ভাষা আর যাপনগত পৃথকতা। যেমন 'মাছ' গল্পের গোড়াতেই বর্ণনা হল :

> পদ্ধতিগত আপত্তি থাকা সত্ত্বেও সে দেড়ফুটের মতন বাঁশের খণ্ডটি

ছুঁড়ে দেয়, তারপর তারই উপর জাল ফেলে। এই পদ্ধতির প্রথাগত নাম 'বাজফেলা'। কার্যত বাঁশের খণ্ডটি টোপ হিসেবেই শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে ছুঁড়ে মারা–জল ও বাঁশের খণ্ডটির সংঘর্ষে উৎপন্ন শব্দ, শব্দে মাছ আসে, বিশেষ করে রাই মাছ।

একেবারে আঞ্চলিক একটা মাছ শিকারের পদ্ধতি, রাই মাছটি উত্তরবঙ্গের, ধরছে যে জেলে তার কোনও নাম প্রথমে নেই, আছে 'সে'-র উল্লেখ। নাম বিশেষের বদলে সর্বনাম। গল্পের তৃতীয় স্তবকে এসে জানা যাবে তার নাম শচী–জানা যাবে 'মাছ, মাছ ছাড়া সর্বস্ব গল্পহীন শরীর কাছে। যে কোনো কথার ভূমিকা অচিরে ফ্যাকাশে হয়ে মাছের কথায় চলে আসে সে।'

এর পরে আছে একটা মোচড়। শচীর মাছ ধরার স্যাঙাৎ নিত্য তাকে বলে–'সম্বন্ধি, তুই নিশ্চয়ই কাল শান্তির সাথে শুয়েছিলি। শান্তির সেন্টের গন্ধে তোর মাথা বিগড়ে গেছে।' এ বারে লেখক সাঁটে জানান : 'শান্তিই একমাত্র ওষুধ যা শচীকে থামাতে পারে। শান্তি শচীর বউ। তখন লাইনের।'

বাড়ির বউ সস্তার সেন্ট মেখে কেন লাইনে নাম লেখাল, আবার শচীই বা কেন তার কাছে যায়, তার সারা গায়ের মেছো গন্ধে বাসি সেন্টের গন্ধ লেখকের জাত বুঝিয়ে দেয়। তবে তাঁর সংযমও চোখে পড়ে। গল্পকে শচী-শান্তির দাম্পত্যকলহ আখ্যানে বা প্রেম ও প্রেমহীনতায় না টেনে নদীর স্রোতের টানে নৌকো ভাসানোর সঙ্গে মাছের দিকেই চলে যান, চলে আসেন নিত্য জেলের দর্শনে। যে কেবল প্রত্যাশার চোখে চায় নদীর দিকে–মাছের প্রত্যাশায়। 'সে ভাবে, কেবলমাত্র জীবন ধারণের জন্য সে জেলে নয়। মাছেদের প্রতি তার গভীর গভীর ভালোবাসা এমনকী তাদের মারবার পরেও সে তাদের প্রতি মমত্ব বোধ করে। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই এদের মারতে হয়। এই নিয়ম, নিয়ম পালনই জীবিকা। কেউ না কেউ, কাউকে না কাউকে, কোনো না কোনভাবে হত্যা করে চলেছে।'

এই শেষ বাক্যটিই প্রায় রঘুপতি উচ্চারণ করেছিলেন 'বিসর্জন' নাটকে। তবে পীযূষ তার দ্বারা গ্রস্ত হয়েছেন বলে মনে হয় না। তাঁর গল্পে হত্যা বা খুন আছে, আত্মহনন ও আত্মপীড়ন আছে কিন্তু মর্বিডিটি নেই-কারণ তিনি নির্মম দ্রষ্টা।

তাই নির্বিকার দ্রষ্টার মতো লেখক বর্ণনা করেন : 'কী একটা কাজে এসে গায়ত্রী দেখে নখের আঁচড়ে রীতার সমস্ত মুখ রক্তাক্ত। সে তার নিজের স্তন নিজেই আঁকড়ে বসে আছে, তাতে প্রতিটি নখের কেন্দ্রবিন্দু থেকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে।' এ হল একটি গল্পের শেষ অংশ, গল্পের নাম 'ক্ষরণ'। পাঠক এই আত্মপীড়নের কাহিনী বুঝতে পারবেন অনেক পরে। অথচ গল্পের সূচনাতেই রয়েছে শকুনের বৃত্তান্ত। পাড়ার কেউ টের পায়নি, কিন্তু একটি তালাবন্ধ ঘরে গলাপচা মৃতদেহের সন্ধানে নেমে এসেছে মৃত্যুদোসর শকুনের পালের আছড়ানো–সাটু খুন হয়ে পড়ে আছে। এই সাটুই রীতাকে ধর্ষণ করেছে একদিন। সাটুর হত্যাকারীর পরিচয় পাওয়া যাবে না কিন্তু–

রীতার কাছে তার বেঁচে থাকাটাই নিরর্থক হয়ে যায়। সে যেন সাটুকে খুন করবার জন্য বেঁচে ছিল এতদিন।

'যাঃ আমার যৌবন নিন্দার, আমার যৌবন লজ্জার' রীতা একথা ভাবতে ভাবতেই আত্মপীড়ন করে স্বহস্তে, রক্তাক্ত করে স্তন।

তাই বলে ভাবার কারণ নেই যে, এ ধরনের গল্প লেখায় পীযূষ ভট্টাচার্য স্বচ্ছন্দ। তাঁর হাতে লোকাচার বা গ্রামিক দেশাচারের উদ্‌ভাস বরং অনেক সাবলীল লাগবে পাঠকের। 'গারসি সংক্রান্তির কাক' বা 'দণ্ডকলসের ফুল' জাতীয় গল্প-নাম একটা আবেশ তৈরি করে –ধরতে চায় এক অজানা লোকজীবন, অন্তত আমাদের গড়পড়তা পাঠঅভিজ্ঞতায়। পল্লীর আয়ুর্বেদিক জগৎ তার ভেষজ বিচিত্রা নিয়ে এমনভাবে তাঁর গল্পে আবহ তৈরি করে যা লেখকের বহুদর্শিতার পরিচয়বাহী.। স্বর্গে আর মর্ত্যে দুটি পা রেখে গারসির কাকের অবতরণ দিয়ে যে গহন উদ্ভিদের গন্ধ আখ্যানে মেশে তাতে যোগ হয় ক্রমে ক্রমে কত না অজানা শব্দ আর অনুষঙ্গ। গল্পের বাগানে :

> পাঁচিলের ও পারে একপাশ ঘেঁষে অর্জুন কালমেঘ বামুনহাটি হাড়জোড়া ক্ষেত পাপড়ার বাগান ।... রুদ্রজটার গৃহস্থ নাম ঈশের মূল। সাপখোপ নাকি আসে না এতে।... যাহা চিচিঙ্গে তারই বন্য ভ্যারাইটির আয়ুর্বেদীয় নাম দধিপুষ্প, স্মৃতিবর্ধক।

গৃহস্থের ব্রতপালন আর ব্রতভঙ্গ নিয়ে জমাট এক শরীরে স্বপ্ন আর স্বপ্নময় জড়িমা এক বিচিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

এর চেয়ে নিবিড় লোকায়তের টান ভরা আছে 'ভাসান' গল্পে, যাতে পূজার চেয়ে ভাসান নিয়ে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা টানটান হয়ে থাকে। পুজো উপলক্ষে জনসমাগম, মেলা, শাঁখা পরা–সেই শাঁখা পরা নিয়ে জড়ানো মিথ বেশ অনায়াসে এসে যায় লেখকের কলমে। মনে হয় যেন কথক নন, পীযূষ, যেন মেলারই উদ্বেলিত অংশভাক। এবং নিখুঁত তাঁর পরিপার্শ্ব জ্ঞান, তাই বলতে ভুল হয় না যে,

> মূর্তির মাথায় আটচালার পাশেই বট-পাকুড়ের যুগল অস্তিত্ব। যা অন্য সময়ে ঘন অন্ধকার সৃষ্টিতে সাহায্য করে। বট-পাকুড়ের আশেপাশে কোমরডোবা জঙ্গলে জোনাকি নেই, ঝিঁ ঝিঁ ধ্বনি নেই। এতো হৈ হট্টগোলের মধ্যে পাতা থেকে ঝরা শিশিরের ফোঁটার টপ্ টপ্ আওয়াজ যেন শুনতে পেল বিভাস। সে চকিতে মূর্তি দেখে।

আমরাও দেখি এক অলৌকিকতাময় গল্পের মগ্নচারী পট।
এর পিঠোপিঠি আসবে যুগে যুগে প্রচলিত দেবীর শাঁখা পরার লৌকিক উপাখ্যান, যাতে

দৃঢ় বিশ্বাস রাখাটাই স্থানীয় নারীকুলের বহুকালের অভ্যাস এবং তারই জাদুটানে গল্পের নায়িকা নিঃসন্তান বিনি বহরমপুরের হাতির দাঁতের শাঁখা পরে। তারপরে চলে বলির পরে বলি। একশো ত্রিশজন মানুষ, একশ ত্রিশটা পাঁঠা। তাদের তীব্র অন্তিম চিৎকার আর ভক্তদের উল্লাস। পুজোর উপকরণ হল কারণবারি, গাঁজা, বোয়াল মাছ, শাঁখা। সব দিকে লেখকের চোখ।

প্রশ্ন হল এখানে বিনি আর বিভাস কেন? অবশ্যই মেলা দেখতে নয়–এ তাদের পুত্রেষ্টি প্রয়াস, তাদের সন্তানহীন যৌবনে। মানতের মাদুলি আর লোকবিশ্বাস তাদের ভরসা। যেন প্রত্যাদেশের মতো শোনা যায়,

> সব মানুষেই বোঝে, কোনো কিছুকে তাকে ভালোবাসতে হবে। ভালোবাসতে এবং ভালোবাসা পেতে, নিজের সুখ নিজেই দেখতে চায়। ভাসানের পর তোকে ও বিনিকে ভেজা কাপড়ে উঠে এসেই ভালোবাসতে হবে। এই নিয়ম, এই প্রাচীন রীতি, কিংবদন্তী, কেউ নাকি বিমুখ হয়নি।

শরীরী সঙ্গম না বলে এই যে ভালবাসা বলা তা ভারি মধুর ও মায়াবী।

পরাবাস্তবের আভাসে বোনা গল্প রচনাতেই পীযূষের কৃতিত্ব সব চেয়ে মৌলিক তাতে সন্দেহ নেই। ভুল বললাম, গল্প রচনা নয়, না-গল্প রচনায়। 'জ্যোৎস্নালোকে হুইলচেয়ার' এমনই এক রচনা যার ব্যাপ্তি মাত্রই দেড় পৃষ্ঠা। হুইলচেয়ারে বসা একজন পুরুষ, দোলন নামক এক নারীকে ধর্ষকের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে যার এই স্থবিরতা–তার বসে থাকা জ্যোৎস্নার শ্রাবণে প্লাবনে, আর ভাবা, এই নিয়ে শীর্ণ এক আখ্যান কিন্তু তীব্র সংবেদী। আত্মকথনে তার বিবৃতি :

> হুইলচেয়ারে বসিয়ে যেখানে বসিয়ে রাখা হয় আমাকে সে ভাবেই থাকতে হয়। বাড়ির বাঁধা কাজের লোকটিই নিয়ে আসে এখানে। এর জন্য সে বোধহয় বাড়তি পারিশ্রমিক পায় চুক্তি অনুযায়ী। কে দেয় কত দেয় তা জানি না এবং কে নিয়ে আসছে প্রতিদিন তার নাম পর্যন্ত জানি না। জেনে কী হবে? মৃত্যু-র অশরীরের গল্পের ভিতর দিন বেশ কেটে যাচ্ছে। ...উঠে দাঁড়াবার পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে হুইলচেয়ারে ওভাবে বসে থাকতে থাকতে মনে হয় সকলেই আততায়ী।

মৃত্যুর অশরীরের গন্ধ আমাদের স্পৃষ্ট করে। এখানে আমাদের মানে সকলের নয়, আমরা সেই বিরল পাঠক, যারা পীযূষ ভট্টাচার্যের লিখন ও লেখকতাকে সম্মান করি। বুঝি যে কাকে বলে খাঁটি অস্তিত্ববাদী রচনাশৈলী। গল্পের শেষ পংক্তি খুব দ্যোতনাময়। আত্মপক্ষে কথক-লেখক ভাবছেন :

> একসময় পৃথিবী আবার আমাকে অধিকার করে নিলে দেখি, কেউ কোথাও নেই–দিগন্ত শূন্যে চাঁদের ছায়া মায়ার বিস্তারে রত সাপের খোলসটির উপর।

এ ধরনের গল্পের পাশে 'বোধন পর্ব' গল্পটি অনেক সমাজবাদী এবং বঙ্গের উত্তর প্রান্তের ক্ষুব্ধ মানসের প্রতিফলক। গল্পটির সম্পদ হল উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপভাষণ ও বিভাষণ। 'ফটক তো খিচ্‌লেন্, মোক একটা দিবার নাগবে'–এই হল ভূমিজ ভাষা। জলের জন্য তৃষিত ভূমির কান্না এ গল্পে, সেইসঙ্গে নারীদের গোপন সংস্কৃতি। 'ফল ফাকর না থাকলি কি মেয়েমানুষকে মানায়?' নারী জমি কর্ষণ সব মিলিয়ে চমৎকার এক বর্ণালী।

এতক্ষণকার আলোচনায় পাঠক নিশ্চয়ই বুঝেছেন পীযূষ ভট্টাচার্য পশ্চিম বাংলার উত্তর খণ্ডে বসবাস করে দায়বদ্ধ সারস্বত কর্মের একজন লক্ষ্যস্থির পদাতিক। তাই কথাকথিত মধ্যবিত্তের প্রেম প্রেম খেলা, নৈতিক অসততা, ভোগবাদী ইতরপনা থেকে তিনি বহু দূরের চেতনাসম্পন্ন প্রগতিপন্থী মানুষ। তাঁর লেখায় যৌনতা বা নারী শরীরের পেশাদারি বর্ণনা নেই। এমনকী সব চরিত্রকে সুঠাম বৃত্তাকার পরিণতি দানেও তাঁর অনাগ্রহ। পড়তে পড়তে চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক কিংবা আত্মীয়তার সূত্র বুঝে নিতে সময় লাগে। তিনি ন্যারেটার নন, দ্রষ্টা বা কথক এক গভীর অর্থে। সেই জন্যে গড়পড়তা বর্ণনা বা নিসর্গের স্বাভাবিক পরিবহ তাঁর গল্পে ভাবনা স্বাতন্ত্র্যে অন্য চেহারা নেয়।

'নির্বাচিত গল্প' সংকলনের ১২০ পৃষ্ঠায় তাঁর ২০টি গল্প এঁটে গেছে–এর থেকে বোঝা যাচ্ছে তাঁর গল্পের অবয়ব সংক্ষিপ্ত এবং তাতে ঘটনার ঘটনঘটা বা উদ্বেলিত নাট্য নেই। তিনি যেন অলস শিমূলতুলোর মতো গল্পগুলোকে ভাসিয়ে দিয়েছেন। ফলে পাঠের পরও যেন মনে হয় গল্প শেষ হয়নি। আমি তাঁর তিনটি গল্পের শেষ পংক্তি ক'টি আহরণ করে দেখাচ্ছি।

> ১। তবে কী মানুষ পৌঁছে যায় এক একসময় এই অনুভূতিতে তখন অপরের সঙ্গে ভেদাভেদ থাকে না, অভিন্ন, জীবনের এপিঠ-ওপিঠ।
>
> ২। আকাশ তো চিরকালই শূন্য। তার নিজস্ব নিশানার হদিশই বা কী, তবুও যেন প্রবল বৃষ্টির ইঙ্গিত নিয়ে এদের মাথার উপর ঝুলে আছে। সবক'টি মানুষই যেন প্রবল বৃষ্টিতে মাটির মতন তালগোল পাকিয়ে যাবে, এই আশঙ্কায় এক সময় পৃথক হয়ে যায়।
>
> ৩। কারো কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না, শুধু পাওয়া যাবে নিজস্ব রক্তপানে একটি সভ্যতার ইতিহাস। এত সকালে হাওয়া চাবকে ধরে ঘোরাচ্ছে মাটিকে, বোঝা যাচ্ছে শুরু হতে চলেছে আরও একটা রুক্ষ দিনের।

পীযূষ ভট্টাচার্য অস্তিবাদী লেখক, তাই ঠারেঠোরে তাঁর সব কথা বলা এবং অনেকটাই না বলা। তবে তাঁর পরিণামী আশাবাদ অস্তিত্ববাদীদের মতো যন্ত্রণাজর্জর অজ্ঞেয়তাধর্মী নয়। তাই তিনি লিখতে চান :

> আত্রাইয়ের নাব্যতা ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষায় আছি। ময়ূরপঙ্খী নৌকা ভেসে যাবে। নদীর প্রতিটি বাঁকের ঘূর্ণির প্রকোপ থেকে বাঁচবার জন্য মাঝিরা মশান কালী বা সত্যপিরের গান গেয়ে উঠবে। নদীপথের পাশে থাকুক না আধুনিক রাস্তা। ছুটে যাক সভ্যতার দ্রুততম যান। অসম্ভব এক মেলবন্ধনের কথা ভাবি সব সময়।

প্রতীচ্যের একজন মনস্বী লেখক বলেছিলেন "What is essential is invisible to the eye", পীযূষ দেখালেন এর উল্‌টো পিঠ, অর্থাৎ, দৃশ্যমানতার মধ্যেকার সারাৎসারটুকু।■

'ঠাকুমার তালপাখা' ও একটি নিবিড় পাঠ

সাধন চট্টোপাধ্যায়

স্নেহাস্পদ অলোক-এর অনুরোধে সাড়া দিতে হল। গল্পকার পীযূষ ভট্টাচার্য আমার অনুজ এবং খুবই ঘনিষ্ঠ। যখন শুনলাম, 'গল্পবিশ্ব' ক্রোড়পত্র করছে বালুরঘাটের সেই কাছের লেখকটিকে নিয়ে, বলতে বাধা নেই, সামান্য দ্বিধায় পড়েছিলাম। অলোককে স্নেহ করি সত্যি, কিন্তু এত ঘনিষ্ঠ, কাছের মানুষকে নিয়ে লেখা, তার সৃষ্টির বিশ্লেষণ নিরপেক্ষতার বাতাবরণ রক্ষা করবে না। দ্বিধাটুকু এ জন্যই। বেশ কিছু দিন ধরে পীযূষের গদ্যে নানা ভঙ্গির বদল, নতুন নতুন বাঁক, গদ্য ও কাব্যের বেড়া ভাঙবার প্রয়াস লক্ষ্য করে আসছি। এ নিয়ে ফোনে ওর সঙ্গে কিছু মতামত বিনিময়ও হয়। কিন্তু সম্পূর্ণই তা ব্যক্তিভিত্তিক ও অন্দরমহলের ব্যাপার। সহসা সে সবের ভিত্তিকে মুদ্রণের বস্তু করে তোলায় ভ্রান্তি আসতে বাধ্য। কিন্তু যে ভাষায় চলমান ও আধুনিক লেখকদের নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ একটা ট্যাবুতে ঠেকেছে, আমাদের দায় আছে তা ভাঙার। পৃথিবীর প্রথম সারির সব ভাষাতেই, আধুনিক ভাবনার কবি-ঔপন্যাসিকদের মূল্যায়নের রেওয়াজ আছে। পক্কেশ বলিরেখা ধারণ কিংবা লেখকের প্রয়াণের জন্য সেখানে কেউ অপেক্ষা করে থাকে না। আর সে জন্যই, সেই সব সাহিত্য ধারায় নিত্য নতুন প্রতিভার স্ফূরণ ঘটে চলেছে। বাঙলায় সেই ট্যাবু ভাঙবে কবে? কারা এগিয়ে আসবে? এমনই মানসিক প্রস্তুতি আমাকে সাহায্য করেছে অলোকের অনুরোধে হ্যাঁ বলতে। লিটল ম্যাগাজিনে অতি সম্প্রতি এই ট্যাবু ভাঙার চেষ্টাকে অনেকেই স্বভাবের জড়তায় ব্যক্তি-বোঝাপড়া বলে ধরে নেয়। যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে না। ব্যক্তি লেখকটি যতটুকু প্রচার পাচ্ছে উপরি পাওনা হিসেবে তার চেয়ে অনেক বেশি লাভ জুটছে আধুনিক লেখালিখির। অনেক বেশি বেশি পাঠক সাম্প্রতিক লেখকদের নিয়ে খোঁজখবর করবেন। মান্যতা বাড়বে লিটল ম্যাগাজিনের। লেখক-প্রাপ্তির কানাকড়িটুকু নিয়ে আমাদের বড্ড বেশি মাৎসর্য, বোঝার চেষ্টা করি না দূরের লাভটুকুর–যা জমে উঠবে সাম্প্রতিক লেখালিখির ভাণ্ডারে।

পীযূষ বয়সে প্রবীণ হলেও, লেখালিখির শুরু গত শতাব্দীর আশির দশক থেকে। কলকাতা থেকে দূরে বালুরঘাটের মতো ছোট্ট শহর থেকে লেখক-স্বীকৃতি পাওয়া কঠিন। পীযূষ তা খানিকটা আদায় করে নিয়েছে। অন্তত বিদগ্ধজনের মধ্যে ওর নাম পরিচিত। ওর 'জীবিসঞ্চার' ছোট্ট উপন্যাসটি নিয়ে কিছু কিছু ইতিবাচক মন্তব্যও শোনা যায় সমালোচকমণ্ডলীতে। কিছু গল্পও

দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। আমি ওর বেশ কিছু লেখালিখি পড়বার সুযোগ পেয়েছি। সংখ্যায় তা বেশি নয় যদিও। পীযূষ এমনিতেই কম লেখে, বহু প্রসবের বেযত্ন তার মধ্যে নেই। এ ব্যাপারে ও খুঁতখুঁতে। আমি প্রধানত ওর একটি গল্পের আন্তর্গঠন নিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করব।

পীযূষ গল্প লেখে না, প্রস্তাব রচনা করে না, সৃষ্টি করে আখ্যান। 'ঠাকুমার তালপাখা' তেমনই বিচিত্রধর্মী একটি আখ্যান। কাব্যের মধ্যে গদ্য ঢুকে পড়ার রেওয়াজ যেমন সুবিদিত, গদ্যের পেটে কাব্য প্রবেশ করানো বা কাব্যধর্মীতার মিশ্রণ লাগানো আধুনিক কথা সাহিত্যের লক্ষণ। বিশেষ করে ইদানীংকার লাতিন আমেরিকা বা আফ্রিকান লেখকরা যা করছেন।

'ঠাকুমার তালপাখা' তেমনই বুনতে বুনতে একটি আখ্যান, যার তলদেশে চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় কাহিনীর অস্তিত্বগুলো ছড়িয়ে আছে। সাধারণ কাহিনী যখন সূত্রাকারে নিটোল রূপরেখার কাঠামো হয়ে তলদেশ থেকে উঠে আসে, আমরা প্লটের সন্ধান পাই।

'ঠাকুমার তালপাখা'-য় কোনও প্লট নেই, আছে একটি বিস্ময়কর নদী, ঠাকুমার তালপাখা, পুরানো বনেদি পরিবার, নদীর বুকে নৌকো, সাঁকো দিয়ে নদী পারাপার, পারানির কড়ি, যাত্রায় মেয়ে-পুরুষ সাজা এবং ছত্রে ছত্রে নানা মুহূর্ত সৃষ্টির আভাস। সেই মুহূর্তগুলো কখনও জুয়োকে প্রতিফলিত করছে, কখনও বন্ধ্যা ছাগলকে, কখনও বাবার যাত্রার আসরে মেয়ে সাজার পরচুলাকে। প্রায় সকল অনুষঙ্গই আছে প্রতীক হয়ে।

> –কী খুঁজছিস?
> –রক্তমাখা পরচুলাটি।
> –ওটা তো ওখানে ফেলে রেখেছি। কাল নিয়ে আসব।
> ঠাকুমা ঘরের ভিতর থেকে চিৎকার করে উঠেছিল 'খবরদার ওসব বাড়িতে ঢোকাবি না–চুল তো নয় যেন রক্তের নদী। বাড়িতে আনলে ঘোর অমঙ্গল।'

আখ্যানের ব্যাপক অংশ জুড়ে আছে নদী। নৌকা চলা। সে নদীর এপার ভাঙছে, গড়ছে অন্য পার। সে নদী টপকেই পরিবারকে আসতে হয়েছে এ পারে। ও পারে যাবার জন্য আছে কেবল সাঁকো এবং পারানির কড়ির জন্য উদ্যত হাত। বজ্র আঁটুনি নিয়ম। আছে প্রাচীন পারিবারিক কুলদেবী। সেখানে ত্রিনয়নী খাঁড়াটি কে বা কারা চুরি করে নিয়ে গেছে বহু দিন। সেই শূন্যস্থানে ঝুলছে ঠাকুমার সেই তালপাখাটি– যেখানে ক্রুশকাঁটায় নদী ও নৌকো চিত্রিত হয়ে আছে।

পীযূষ আখ্যানটি নির্মাণ করতে গিয়ে সময়কে করে দিয়েছে অস্তিত্বহীন। লেখকের কলম-নির্দেশে কাল এখানে গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু দেশ লাভ করেছে বিস্তৃতি। এই বিস্তৃত দেশের মধ্যেই ঠাকুমা, বাবা, তার ছেলে–পুরুষানুক্রমিক একটি যাত্রা চলেছে। চলছে নিয়তি ও অস্তিত্বের দ্বন্দ্বে বিক্ষত কসাই, জুয়াড়ি, হাঁটুরে, পারানির মালিক–অজস্র মানুষের ছবি। তাদের ছায়াময় অস্তিত্বগুলোকে আখ্যানের নানা ভাঁজে ঘুরে বেড়াতে দেখি। উপলব্ধি করি আমাদের ভূত থেকে ভবিষ্যতের পথে ক্রমাগত যাত্রার অমসৃণ অনিশ্চয়তা। এই বোধটুকু ছেঁকে নিতে হয় আখ্যান থেকে একেবারে সঙ্গীতের মূর্ছনায়।

কাব্যের দায় নয় বিষয়কে বোঝাবার, প্রাণিত করাই একমাত্র কাজ–এমন মন্তব্য করেন কোনও কোনও বিখ্যাত কবি-লেখক। তাহলে কি, গদ্য কেবল অর্থ বোঝাবে? প্রাণিত করবে না? পাঠককে। আর যে গদ্য কাব্যকে বেশি বেশি আপন শরীরে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়?

আসলে, ভাষা-শিল্পের ওপর পাঠকের দু-দুটো দাবি। প্রাণিত করবে, অর্থও বুঝিয়ে দেবে। মানে, বিষয় থাকতে হবে। বিষয়কে লেখক কীভাবে ব্যক্ত করবেন, তা যার যার মতো। 'ঠাকুমার তালপাখা'-য় পীযূষ বহু স্বরের টুকরো টুকরো রাগিনী সৃষ্টি করেছে, যা পাঠকদের মনে বিষয় ছেঁকে কেবল অনুভূতি তৈরি করে। কিন্তু বিষয় তাতে পুরোপুরি ছাঁকনিতে আটকা পড়ে না। দেশ ভাগ, বিপর্যয়, ঐতিহ্যের ভাঙন, অসংখ্য মানুষের পুরুষানুক্রমিক ভিটা ত্যাগ, অনিশ্চয়তা ঐ 'ঠাকুমার তালপাখা' আখ্যানে তালপাখার প্রতীকে, নদীর প্রতীকে এবং নানা অনুষঙ্গে নতুন একটি চেতনার জন্ম দিচ্ছে। সেটিই বিষয় এখানে। আখ্যানের বুনোট অনেকটা বিষয়ীগত কিন্তু লিখন কৌশলে তা বিষয়গত হয়ে গেছে।

পীযূষ তার আখ্যানে নীরবতার ভাষাকে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছে। 'ঠাকুমার তালপাখা' আখ্যানে লেখকের সফলতা, এই 'নীরবতাকে পাঠকের চেতনার ভাষায় রূপান্তরিত করা।'

> জলপথের যাত্রীদের মধ্যে অনিবার্যভাবে যা ঘটে থাকে সূর্যাস্তের পর–এক আশ্চর্য নীরবতার মধ্যে নিকটতম দাঁড়ের শব্দ শোনা যায় না, শুধু শোনা যায় দূরের শুধু দূরের দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণের মধ্যে নৌকার দাঁড়ের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত জলের ঢেউ অস্ফুট শব্দ করে ছড়িয়ে পড়ার শব্দ।

এখানে নীরবতাই ভাষা। কিংবা ভাষাই নীরবতার দাবি জানাচ্ছে পাঠকের কাছে। এবং নীরবতাই যখন ভাষা হয়ে ওঠে–পায় অফুরন্ত শক্তির সন্ধান। পীযূষের এই আখ্যানটি বেশ শক্তিশালী। আখ্যানের শেষে আমরা লক্ষ্য করি, পুরাতন প্রতীকগুলো ভেঙে গিয়ে, সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন প্রতিঘাত। যে তালপাখা ও নদী আখ্যানে সমান্তরাল প্রতীক হয়েছিল, এক্কেবারে শেষে তা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গেল, উপরিপাতও দিল ঘটিয়ে।

> বিশাল তালপাখা নিয়ে ঘাটে আসতেই দেখে নদীই নেই–শূন্য মাঠে রাতজাগা পাখি রাতের পোকাদের গর্ত থেকে বার করে খাচ্ছে আগামীকাল বেঁচে থাকবে বলে। বাতাসে তালপাখাটি তার দাঁড়ের মতন দুলছে, সে ভাসছে, সমস্ত যাত্রাপথ নদীপথ হয়ে যাচ্ছে।

নৌকো, নদী ও তালপাখা এখন একত্রে বৃহৎ একটি যাত্রায় (destiny) পরিণত। এই যাত্রার ট্র্যাজেডি বিগত ষাট বছর ধরে বাঙালি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

আখ্যানে লেখকের বহু শব্দ বাহুল্য। অযত্নে ব্যবহৃত বলে মনে হয়। নানা ব্যঞ্জনা সেসব দুর্বলতা ঢেকে দিয়েছে। আমরা পীযূষ ভট্টাচার্যকে এই আখ্যান সৃষ্টির জন্য বাহবা দিই। স্বাগত জানাই নিজেকে ক্রমাগত ভাঙতে ভাঙতে চলার প্রয়াসকে।■

কাছের কথাকার

অজিতেশ ভট্টাচার্য

১

নয়ের দশকের মাঝামাঝি। কফিহাউসে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে এসে গেল গল্প। কে কী রকম লিখছেন। কার গদ্য কী রকম। চিরদিন লিটল ম্যাগাজিনের লেখকদের নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখার চেষ্টা করেছি। এই বিষয়ে বিশেষত উত্তরবঙ্গের রসদ সাপ্লাই দিলাম। দেওয়া আমার অভ্যাস। কথা উঠলেই বলেছি, পীযূষ ভট্টাচার্য ডিফারেন্ট প্রোজ লিখছেন। সেই প্রোজের নিজস্বতা অস্বীকার করা যাবে না। টেবিলে ভগীরথ মিশ্র, সাধন চট্টোপাধ্যায়, কিন্নর রায়, শচীন দাস এবং আরও দু-চারজন। তর্ক জমে গেল–ডিফারেন্ট প্রোজ কাকে বলে? প্রত্যেক লেখকের প্রোজ কি ডিফারেন্ট নয়? তাঁরা কি অন্যের ধার করা প্রোজ লেখেন? আমি অবশ্য জায়গা ছাড়িনি, পীযূষের গল্প রচনার সূত্রপাত থেকে অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতায়, ইতিমধ্যে 'মধুপর্ণী'-তে অন্তত ছ'টি গল্প প্রকাশিত হয়ে যাওয়ায়, গল্পকারের পাণ্ডুলিপি শ্রবণ ও বিচারের অভিজ্ঞতায়, আলাপ-আলোচনা, তর্কে-বিতর্কে আমি কনভিন্সড যে পীযূষ গদ্য প্রতিস্থাপনে অন্য পথের যাত্রী। তার গদ্যের মধ্যে এক ধরনের ছন্দবদ্ধ যন্ত্রণা আছে, তার বহিঃপ্রকাশ তির্যক। তার গদ্য এক্সপেরিমেন্টের বিষয়–সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় গদ্য রচনার বাঁধা সড়ক থেকে বিকল্প সড়কের সন্ধানই উদ্দেশ্য। তাই পীযূষ গল্প লেখে না, অভিজ্ঞতালব্ধ দর্শনের কথা লেখে। একজন গ্রাসরুট লেভেল রাজনৈতিক কর্মীর শিল্পীর স্বাধীনতা অর্জনের অবিরাম প্রক্রিয়ার মধ্যে পীযূষ পৌঁছে গেছে অন্দরমহল থেকে বাহির মহলে, দেখা হয়ে গেছে অনেক ফাঁকফোকর, দড়ি টানাটানি, লাভ-ক্ষতির হিসেব-নিকেশ, ক্রূরতা এবং মিথ্যাচার। তাই রোমান্টিকতা নয়, পীযূষকে প্রবলভাবে ধাক্কা দিয়েছিল জীবনযুদ্ধের বাস্তবতা। বিশ্বাস নয়, অবিশ্বাসের পাথর সরিয়ে খুঁজে দেখা পাথর চাপা মানুষের খোঁজখবর। তাই নিটোল গল্প রচনার বাইরে থাকার দুরন্ত প্রতিজ্ঞা, আবেগকে ঝেড়ে ফেলার অবিরাম যুদ্ধ। প্রতীকী হয়ে ওঠার নিরন্তর প্রয়াস, বলা-না-বলার মাঝপথে দোদুল্যমানতা, আদি-মধ্য-অন্ত ফর্মুলাকে সবলে অস্বীকার এবং হাতুড়ি-ছেনি দিয়ে কেটে কেটে গদ্যকে সাজিয়ে দেওয়া–এই হল পীযূষ ভট্টাচার্যের গদ্যের আলাদা হবার নমুনা।

২

এত কথা বলার প্রয়োজন হত না যদি না 'গল্পবিশ্ব'-এর সম্পাদক অলোক গোস্বামী তার নিজস্ব স্টাইলে কথাটা ছুঁড়ে দিত–অজিতেশদা, লিখবেন নাকি? তখন তো বুঝতে পারিনি পীযূষের কথা বলতে গেলেই স্তিমিত কুড়ি আর কল্লোলিত কুড়ি এই চল্লিশের লম্বা দৌড়ে আমাকে নাজেহাল হতে হবে, অনুক্তি এবং অতিশয়োক্তির সম্ভাব্য বিপদ আমাকে তাড়া করবে! একজন কথাশিল্পীর পরিশ্রমী চিন্তকের ভূমিকায় আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠার অবিরাম প্রয়াস, এ সব হিসেব আমাকে দিতে হবে!

রবীন্দ্রনাথের একটি শব্দ বদলে দিয়ে যদি বলি–'আমরা দু'জন এক শহরে থাকি/ সেই আমাদের একটিমাত্র সুখ' তবে কাব্য করার দায় ঘাড়ে চাপবেই। এই বহু সুখের সময়ে একটিমাত্র সুখের কথা বললে অতিশয়োক্তি দোষের সন্দেহ তির্ তির্ করে আঁকাবাঁকা পথে চলে যেতে পারে। বালুরঘাট শহরে বিয়াল্লিশ বছর বসবাসের ফলে ছোট পীযূষ বড় হল, নবীন অজিতেশ হল প্রবীণ! বিয়াল্লিশ বছরের শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, শরৎ-হেমন্ত-বসন্ত, ভরা কোটাল আর মরা কোটাল, আত্রেয়ীর জল, একটি বৃত্তাকারের দীর্ঘ পথের নানা শাখায় ছড়িয়ে পড়া, পুলক নিয়োগী লেনের দোতলার সাত ফুট বাই ন'ফুট একটি ঘরে, চায়ের দোকানে, ছাপাখানায়, সভা-সমিতি, আড্ডা ও মজলিশে, রাজনৈতিক টানাপোড়েনে, সামাজিক দায়বদ্ধতায় দু'জনের মুখোমুখি না হয়ে উপায় নেই।

পাশাপাশি না হলেও আমরা কাছাকাছি থাকি, বয়সের দিক থেকে এক দশকের ব্যবধানে থেকেও, অন্তরঙ্গতা এবং আলাপচারিতা, অন্তত গত তিন দশক ধরে নিবিড় হয়েছে। সম্পর্কের মধ্যে বাইরের বেনোজল মাঝেমধ্যে ঢুকে খলবল করে বেরিয়ে গেছে। ফলে হলফ করে বলতে পারছি না যে নিজের কথা না বলে শুধু পীযূষের কথা বলতে পারব। এটি গবেষণাপত্র নয়, পীযূষের ঠিকুজি লেখাও আমার দায় নয়, এমনকী তার সাহিত্য বিচারের ভারও কাঁধে তুলে নিতে পারি না। এত 'না' সত্ত্বেও কিছু বলার থেকে যায়, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে সেই পথে এবার পা বাড়ালাম।

৩

ছয়ের দশকের শেষ পর্বে, পীযূষ ভট্টাচার্য যখন তরুণ তুর্কি, 'কৃন্তন' কবিতাপত্রকে সামনে রেখে 'মধুপর্ণী'-র প্রতিস্পর্ধী হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা, পীযূষ তার স্বেচ্ছাসৈনিকদের একজন। ১৯৬৫-তে 'মধুপর্ণী' প্রকাশিত হবার পর শহরে যে প্রতিক্রিয়া হয় তা সংক্ষেপে 'এই পত্রিকা এলিটদের মুখপত্র, এখানে তরুণতম প্রজন্মের কোনও কার্যকরী ভূমিকা নেই। অতএব কৃন্তন।' কিন্তু বালুরঘাটের মাটিতে যুদ্ধ জমে না। মলয়-বিমল-তড়িৎ-পীযূষ এবং অন্যান্যরা আমাকে এ টেবিলে বসিয়ে চা খাওয়ায়, বাড়িতে বসিয়েও আড্ডা মারে, তারপর নিজেদের মধ্যে একজোট হয়ে 'এলিট' বলে মুণ্ডপাত করে। সাহিত্যের ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে, বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাস ঘাঁটঘাঁটি করে, পত্রিকা গোষ্ঠীর মধ্যে কোমল-কঠিন কোলাহলের বিষয় জানা থাকায়, এই নতুন সাহিত্য মনস্ক তরুণদের পেয়ে আমি যেন আর একটু বিস্তারিত হয়ে গেলাম। দূরবর্তী মফস্বলের এই শান্ত শহরে ঐতিহ্যের

লক্ষণরেখা পার হবার জন্য বিদ্রোহের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু 'কৃত্তন'-এর কারিগররা এই যুদ্ধ কত দূর চালিয়ে যেতে পারবে, সে বিষয়ে সংশয় ছিল। প্রচুর আড্ডা এবং স্বপ্ন দেখার মধ্য দিয়ে দু-তিন বছর অনিয়মিতভাবে 'কৃত্তন' বেরুবার পর ঝাঁপ বন্ধ করে দিল। পরবর্তী সময়ে 'মধুপর্ণী'-র সমান্তরালভাবে আরও নতুন নতুন সাহিত্য পত্রিকা বেরিয়েছে, তবে 'কৃত্তন'-এর পর এই ধারার সাড়া জাগানো পত্রিকার নাম 'প্রতিলিপি'–সম্পাদক অমল বসু–এবং যথারীতি 'প্রতিলিপি'-র একটি গোষ্ঠী ছিল, এবং 'কৃত্তন'-এর দু-চারজন তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন–পীযূষ ভট্টাচার্য তাঁদের মধ্যে একজন। অবশ্য পরবর্তী সময়ে পীযূষ বুঝতে পারে, পত্রিকা নয়, লেখাই তার কাজ।

সূচনা লগ্ন থেকেই 'মধুপর্ণী'-র সাহিত্য পাঠের আসরে শহরের নবীন-প্রবীণ সব কবি-লেখকের ছিল সাদর আমন্ত্রণ। পাঠ ও আলোচনার মধ্য দিয়ে সে সব সন্ধ্যা উপভোগ্য হয়ে উঠত। নবীন পীযূষকান্তি সেই সব সভায় কবিতা পাঠ করে কবি বলে পরিচিতি ও স্বীকৃতি পেল। এই কাব্য ভাবনা থেকে পীযূষ এখন অনেক দূরে। কিন্তু অভিজ্ঞান রেখে গেছে প্রথম মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থে–'মহিন্ন অসুখ মহিন্ন যন্ত্রণা' (১৯৯১)। এই সাঁইত্রিশ পৃষ্ঠার চটি বইটিতে পীযূষ তার সমাজ চিন্তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে।

পারিবারিক জীবন এবং চাকরি জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে, আহরণ ও সংরক্ষণের বাসনা নিয়ে পীযূষ যে অধ্যাপক কালিদাস ভট্টাচার্য থেকে গল্পকার ও ঔপন্যাসিক অভিজিৎ সেন পর্যন্ত, সংবাদপত্রের নাছোড়বান্দা রিপোর্টারের মতো পিছু ধাওয়া করে চলেছে, এ সংবাদ অনেকের অজানা ছিল না। 'মধুপর্ণী' তখন বালুরঘাটকে, জেলা ছাড়িয়ে সমগ্র উত্তরবঙ্গ হয়ে দক্ষিণবঙ্গের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে–স্বাভাবিকভাবেই বালুরঘাটের সাহিত্য-সংস্কৃতি মনস্ক মহলে তার প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। ঘোষিত এবং অঘোষিত বিরুদ্ধবাদীদের সকলে মুখ চেনা। 'মধুপর্ণী' গোষ্ঠীর মধ্যে না থেকেও পীযূষের ভূমিকা সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলিতে সেতুবন্ধনের। 'মধুপর্ণী'-র সেমিনার, সাহিত্যসভা, উৎসব আয়োজনের ক্ষেত্রে পীযূষ ছিল পরামর্শদাতাদের একজন। ১৯৬৫ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত দূরত্ব ও নৈকট্যের দুই দশক কাটিয়ে দিয়ে অবশেষে গল্প নিয়ে আমরা একটি কমন প্ল্যাটফর্ম খুঁজে পেলাম। আমার প্লট নির্ভর এবং চরিত্র নির্ভর গল্প নিয়ে পীযূষের খুব একটা মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু পীযূষের গল্প শুনে, 'মধুপর্ণী'-তে পর পর ছাপিয়ে আমার মাথাব্যথা দেখা দিল। পীযূষের পূর্বজ ভগীরথ মিশ্র এবং অভিজিৎ সেন ততদিনে কলকাতার প্রেক্ষাপটে স্থাপিত। গ্রাম বাংলা এবং গ্রামীণ জীবনই তাদের সাহিত্যের মূল বিষয়। আঞ্চলিক সংলাপ প্রয়োগে দু'জনই তুখোড়–একজন উত্তর বাংলার আর একজন রাঢ় বাংলার। কিন্তু সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরও তাদের সাহিত্য পাঠে বোঝা গেল 'গল্প'-কে ছেড়ে দিতে কেউ রাজি নয়। কিন্তু পীযূষ ভট্টাচার্যের যাত্রা শুরু হল প্রথাসিদ্ধ গল্পকে হাঁড়িকাঠে বলি দিয়ে। যদিও রক্তের দাগ তাকে অনুসরণ করে গেল, তাই গল্প না বলার মধ্যেও গল্পের মায়া বিচ্ছুরিত হয় বারবার। সমস্ত খণ্ড ছিন্ন, আপাত অসংলগ্ন, স্বেচ্ছাচারী বয়নের মধ্যে এক ধরনের অবয়ব ফুটে ওঠে। এই রীতিতে তার গদ্য হয়ে ওঠে একান্তই নিজস্ব–অন্বয়–অনন্বয়ের খেলায় লেখক সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠে ক্রমশ।

কবি থেকে কথাকার হয়ে ওঠার প্রস্তুতি আটের দশকের গোড়া থেকে। ক্রমশ আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে জেলা স্তর থেকে মহানগর পর্যন্ত সেতুবন্ধনের কাজে প্রথম থেকেই পীযূষ তৎপর হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষে আটের দশকের মাঝামাঝি থেকে তার পদযাত্রার সূত্রপাত। ১৯৯৫-তে 'কুশপুত্তলিকা' গল্পগ্রন্থ প্রকাশের মধ্যে তার অভিষেক পর্ব সম্পন্ন হল। 'কুশপুত্তলিকা' প্রমাণ করল পীযূষ ভট্টাচার্য বাঁধা পথের যাত্রী নয়। নিজের পথ খুঁজে নেবার দায়িত্ব তার নিজেরই। নিজেকে আলাদা করে নেবার এই প্রবণতা তাকে শেষ পর্যন্ত কতখানি সাফল্য দিতে পারবে, তার বিচার ভবিষ্যতের গর্ভে। 'কুশপুত্তলিকা'-র (রক্তকরবী) মোট গল্প সংখ্যা দশ। পৃষ্ঠা মাত্র ছিয়াত্তর। সর্বাপেক্ষা হ্রস্ব গল্প 'বৈতরণী' (৬ পৃষ্ঠা), অন্য নয়টি গল্প ছয় থেকে আট পৃষ্ঠার মধ্যে। নির্মেদ ছোট গল্পের উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। আয়তনের দিক থেকে গল্পের কৃতিত্ব নিরূপিত হয় না, কিন্তু বোঝা যায় গল্পকারের প্রবণতা, তার চরিত্র। কত কম কথায় কত ঠিক কথা বলা যায়, সম্ভবত এরকম একটি পরীক্ষায় লেখক নিজেকে প্রমাণ করতে চেয়েছিল। তার জীবন দর্শন এবং গদ্য রীতির পরীক্ষার জন্য 'কুশপুত্তলিকা'-কে পীযূষ দহনদগ্ধ হবার জন্য পাঠকের চলমান স্রোতে পৌঁছে দিয়েছিল। গল্পকার হিসেবে আমি কী বলি এবং কেমন করে বলি, আর পাঠক হিসেবে তুমি কী বোঝ এবং কেমনভাবে নিতে পারো, এরকম একটি সোজাসুজি দ্বন্দ্বযুদ্ধে গল্পকার পীযূষ ভট্টাচার্য সচেতনভাবে নেমে পড়েছিল।

'অঞ্জু যখন ধাপে ধাপে সমাধানের পথে যাচ্ছে তখন মাঝপথে কতদিন থেমে গেছে শংকর।' যদি বলি মার্কেসের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী প্রথম লাইনটা মনে না আসা পর্যন্ত পীযূষ লিখতে পারে না এবং সেই পংক্তিটি উঠে আসে হঠাৎ, এবং উঠে আসে গল্পের মাঝখান থেকে–তবে গল্পকার পীযূষ ভট্টাচার্যকে বোঝার একটি সূত্র পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। জীবন যে অঙ্কই এবং ধাপে ধাপে এগুলেও হঠাৎ মাঝখানে থেমে যাবার সম্ভাবনা প্রবল–এই বার্তা অজানা কোনও ব্যাপার নয়, অথচ চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয় উপস্থাপনার গুণে। 'কুশপুত্তলিকা'-র আরও একটি পংক্তি–'কাঁঠাল গাছটির ঘন ছায়া ভেদ করে কয়েকটি রৌদ্রফলকের ঝাঁপিয়ে পড়া দোলন দেখছে'–'রৌদ্রফলক' চিত্রময়তা 'দোলন'-এ এসে পূর্ণতা পায়। কাটা সংলাপ, সংক্ষিপ্ত বিবরণ, উপস্থাপনার কৌশল, জানা-অজানার আলপথ, অন্যমনস্ক হলে যে কোনও দিকে ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা–পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পের এই হল বিশিষ্টতা। প্রথম গল্পটিই জানিয়ে দেয় পীযূষ প্রচলিত গদ্যরীতিকে ভাঙতে চায় কাহিনী ও চরিত্রের বিন্যাসের সামনে পেছনে এগিয়ে দিয়ে। পরবর্তী দেড় দশকের গল্পগুলিতে দু'টি আণ্ডরেখার সন্ধান পাওয়া যায়, এক, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রাজনীতির ঘাত-প্রতিঘাত এবং দুই, বেহুলা গীতির অন্তর্মুখী প্রবাহ। যেন বাস্তব থেকে পরাবাস্তবে চলে যাওয়ার আলোছায়ায় দাঁড় টানাটানি। মার্কসীয় দর্শনের সঙ্গে যে লেখকের গাঁটছড়া বাঁধা আছে এবং লোকপুরাণের মিথ তার মগ্নচৈতন্যকে দহন থেকে মুক্তি দিতে পারে, এই তথ্যের ভিত্তি ক্রমশ দৃঢ় হয়।

পীযূষের গল্পে এক ধরনের অকথনের অন্ধকার থাকে, উল্লম্ফন ঘটে বারবার। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর ইঙ্গিতময়তার জন্য পাঠক বোঝা-না-বোঝার ভার বহন করতে বাধ্য। প্রথা,

সংস্কার, লোকশ্রুতি, ইতিহাস, পুরাণ, দর্শন এবং রাজনৈতিক সমীকরণ বিষয়ে লেখকের মধ্যে অনেক কথা জমে আছে–যেমন 'কীর্তিমুখ'–সরল বয়ানে চপল বিদ্যুৎবাণ। হিসেবের বাইরে কিছু থাকে না, এবং নীতি-দুর্নীতির সংজ্ঞা সমাজে প্রভুত্বকামী মানুষের হাতে। খুনের রাজনীতি বা সশস্ত্র সংগ্রাম–হিসেবের পাই পয়সার লেনদেনের মতো সহজ সরল।

লেখকের কৃৎকৌশলের আরেকটি নমুনা দেখা যায় পাঁচ পৃষ্ঠার সব চেয়ে ছোট গল্প 'বৈতরণী'-তে। বয়ানে এবং সমাপ্তিতে নির্মাণ শৈলীর চাতুর্যের অবশ্যম্ভাবী সূত্রটির ছায়াপাত ঘটে। মুকুটের সঙ্গে বিজনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল কিংবা আছে কিনা, এবং হরিশংকরের হত্যাকারী বিজন কিনা–এই প্রশ্ন দু'টির উত্তর পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলে এই গল্পটি পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্প হত না। ধ্রুপদী বা প্রচলিত গদ্যরীতির বাইরে গিয়ে নতুন নির্মাণ ক্ষেত্রের সন্ধান, ইতিহাসের অন্ধকার থেকে উপাদান সংগ্রহ, চলমানকে উৎসমুখের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া, অবিশ্বাস ও হনন প্রবৃত্তির অন্তর্গূঢ় বিন্যাস–পীযূষের নিজস্ব গদ্যরীতি তৈরিতে সাহায্য করেছে।

'কীর্তিমুখ' শুধু সাহসী গল্প নয়, একজন ক্রিটিকের গল্প, যা প্রেক্ষাপটের সরলীকরণকে একটি জিজ্ঞাসার বিন্দুতে স্থাপিত করতে পারে। ব্যক্তির জীবন যে ব্যক্তির নয়, সংস্কার ও সামাজিক প্রথা, নির্জ্ঞান ও সজ্ঞান স্তরের নিয়ত বোঝাপড়া, অধিকারের কৌশল, এবং অসহায়তা এক ধরনের বলয় তৈরি করে যার ভেতরে ঢুকে যাওয়া শ্রমসাধ্য–কারণ গদ্যকে সরলরেখায় বিন্যাস করে এ সব কথা বলা যায় না। তাই তাকে স্থানচ্যুত করতে হয়, এমনকী দূরান্বয় এবং দূরভাষ অপরিহার্য।

মহাশ্বেতা দেবী, কমলকুমার মজুমদার, অমিয়ভূষণ কিংবা অভিজিৎ সেন সূত্রপাতে আদৌ পীযূষের গদ্য শৈলীতে নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছেন কিনা–এই প্রশ্ন অবান্তর। তা হলে বর্ণমালা লিখতে গিয়েও আমাদের অন্যের ঋণ স্বীকার করে নিতে হয়। ধরা যাক 'দহ' গল্পটির আদি-মধ্য-অন্ত অনেক বিচ্ছুরণ সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত সরল। অথচ সরল নয়। কারণ সূচনার আকস্মিকতা এবং সমাপ্তির প্রশান্তির মধ্যে ঐক্যসূত্র খুঁজে পাওয়া এক পরীক্ষা।

অর্থাৎ পীযূষ ভট্টাচার্যের সরল ও সহজবোধ্য হবার উপায় নেই। সেই সহজিয়া সাধনা তার নয়। গল্প শোনার আগ্রহ নিয়ে বসে পড়লে কপালে ভাঁজ পড়বেই, গল্প তো ভেঙে ভেঙে চৌচির, কথা আছে কথাকে ঢেকে দেবার জন্য, যতি চিহ্নের ব্যবহারেও যদৃচ্ছা স্বাধীনতা, এবং বাক্য শেষের ছেদচিহ্নটিও সব সময় জরুরি নয়। দৃশ্যের ভিতর দিয়ে অদৃশ্যের সন্ধান, মায়ামুকুরের ব্যবহার, মিথ ভাবনার দুর্নিবার স্রোত পুরাণ কথাকে টেনে আনে ঘরের কোণে, ছিপ হাতে যেন বসে আছে ধর্মবক, সৃষ্টি এবং ধ্বংসের আবর্তে অকম্প দুই পাখির সমন্বয়।

এমনকী নির্বাচিত গল্পের 'ভূমিকার পরিবর্তে' কথাসন্ধিতে আত্মকথনের কল্পকথাও নির্মাণ হয়ে ওঠে, ঘেরাটোপের মধ্যে ঢুকতে গেলেই ভাঙা বেড়ার সন্ধান নিতে হয়। এমনকী সরল সত্য উচ্চারণের জন্যও কঠিন বর্ণমালার সমাবেশ শিল্পীর বিরোধাভাসকে সুস্পষ্ট করে। আত্রেয়ীর উপকথায় পুরাণ অভিযান কিংবা উত্তরবঙ্গের ঋতু ও প্রকৃতি বর্ণনায় সাড়ম্বর উপস্থাপনা–'তরাই-এর মেঘ গলিত ধাতুর মতো সগর্জন নেমে প্রতিমা ছাঁচে পড়ে স্বর্ণমূর্তি

হয়ে যায় হেমন্ত'–এই নির্মাণে ছেনি-হাতুড়ির ব্যবহার প্রত্যক্ষ।

৫

শুরুতে যা বলেছিলাম–আমরা দু'জন এক শহরে থাকি–পাশাপাশি না হলেও কাছাকাছি চার দশকের নৈকট্য ও দূরত্ব, গ্রাসরুট লেভেল রাজনৈতিক কর্মীর স্বাধীন শিল্পী সত্তা বিকাশের পর্ব থেকে পর্বান্তর, বাল্য-কৈশোরে অবগাহনের অনিশ্চয়তা, প্রথম তারুণ্যে কবিতার সঙ্গে হাত ধরাধরি, বঞ্চিত হবার ক্রোধ এবং অভিমান, মিথ্যাচার ও অন্তঃসারশূন্যতার নিত্য আস্ফালন–গদ্যকার পীযূষ ভট্টাচার্যের হাতে কলম তুলে দিয়েছিল। এবং পীযূষ গদ্য রচনা করে, যা কিনা গল্প।

আটের দশকের মাঝামাঝি থেকে অনিন্দ্য ভট্টাচার্য এবং কমল সরকারের জোরদার নেপথ্য ভূমিকা–(দু'জনেই প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন গল্পকার এবং কবি এবং আড্ডাবাজ) কিছু টানাপোড়েনের পর পীযূষের সঙ্গে আমার আবার ছাড়া ছাড়া নয়, স্থায়ী সেতুবন্ধনের কাজটি সম্পন্ন করল। আরও এক দশক পর পূর্ত বিভাগের শবর রায়, আর এক তর্কবাজ আড্ডাবাজ কবি, তাতে সিমেন্টের গুঁড়ো মিশিয়ে দিল। বুঝলাম, আমরা দু'জন খুব কাছের বলেই কাছে আসতে দু' দশক লেগে গেল। অনিন্দ্য-কমল-শবররা আবার মহানগরের হাতছানিতে ছায়াপথে পাড়ি জমিয়েছে। আমরা এখন দু'জন দু'জনকে পাহারা দিচ্ছি–আত্রেয়ী তীরবর্তী শহরের কুহকে আচ্ছন্ন দুই মানস যাত্রী–দুই দিশার দুই নাবিক এবং অনৈসর্গিক জলযানে ভাসমান। সাক্ষী থেকে গেলাম পীযূষের উত্থান পর্বের, যুদ্ধযাত্রার, অফুরন্ত জেদ এবং পরিশ্রমের, এবং অধ্যবসায়ের, আত্মবিশ্বাস এবং অস্মিতার।

ভাসান, জঠর, কুশপুত্তলিকা, গারসি সংক্রান্তির কাক, পচন প্রক্রিয়া, দহ, দণ্ডকলসের ফুল, কীর্তিমুখ, বোধন পর্ব, জ্যোৎস্নালোকে হুইলচেয়ার, পদযাত্রায় একজন, রমাকান্তের সরলা উপাখ্যান ইত্যাদি ইত্যাদি গল্পগুলি পাণ্ডুলিপি আকারেই অপারেশন টেবিলে ফেলে দেখা হয়েছিল দুই-তিনবার করে–এই প্রক্রিয়া চলেছিল প্রায় দশ বছর, পীযূষের সে সময় দরকার ছিল অন্য আর একজনের চোখ, যে চোখ পক্ষপাত করে না, বিশ্বস্ত এবং অকপট। দু' হাজার সাল থেকে এই অপকর্মের অবসান। সুখের বিষয়, অনেক তর্ক-বিতর্কের পরও পীযূষ প্রায় আমার কোনও সংশোধন বা পরামর্শ গ্রহণ করেনি। আসলে সৃজন প্রক্রিয়ায় আমরা দু'জন দুই মেরুর বাসিন্দা। আমার দোদুল্যমানতা আর পীযূষের দৃঢ়তা পরস্পরের উল্টোপিঠ। পীযূষের সামনে এগুবার ইচ্ছে প্রবল। এই ইচ্ছেশক্তি সব সময় বারুদের কাজ করে, অপেক্ষা খোঁজে যথাস্থানে বিস্ফোরণ ঘটাবার।

উপন্যাস অব্দি আর যাওয়া গেল না। গল্পতেই কথা সাহিত্যের 'কথা' শেষ। এখানে কফিহাউস নেই, দীনবন্ধু মঞ্চ নেই, আছি আমরা দু'জন–প্রায় সন্ধ্যায় আড্ডার মৌতাতে জমে যাই–'সেই আমাদের একটিমাত্র সুখ।'

৬

পীযূষ যখন ল্যাটিন আমেরিকার সাহিত্য নিয়ে পঠনরত, মার্কেসকে আতস কাচের

নিচে রেখে বিচারে ব্যস্ত, সূত্র কী এবং কোথায়, বিন্যাস কোন কোন স্তর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়, ইত্যাকার গবেষণায় উদয়াস্ত, স-তর্ক বিনিময়ে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে থাকি। গল্পের শরীরী বিন্যাস, অবয়ব সংস্থান ইত্যাদি নিয়ে, এমনকী সংলাপের অন্তর্মুখীনতা থেকে বহির্মুক্তি বিষয়ে আমার বাগাড়ম্বর, পীযূষ তখন ধৈর্যশীল শ্রোতা, কিন্তু তাকে চরিত্রভ্রষ্ট করা যায় না। এমনকী সোলেমান রুশদির মতো গদ্যকারও কেন প্রাসঙ্গিক–এই বিষয়ে তার উৎক্ষেপণ স্ববিচার নির্ভর।

অনুসন্ধানই একজন জীবিত লেখকের ধর্ম, তাই চিন্তন-ধর্মের প্রক্রিয়া অনুযায়ী মিথ ও পুরাণ কথার বিপুল বিস্তার সম্মোহনের সৃষ্টি করে, ব্যবহারের মধ্য দিয়েই মিথ বারবার নববস্ত্র পরিধান করে, এই সূত্র গোত্রান্তরিত করে তার ব্যবহার পীযূষের প্রচেষ্টার অঙ্গ। আন্তর্জাতিক স্তর থেকে দেশীয় ঐতিহ্যপুষ্ট ঠাকুমার তালপাখাও সেই বৃত্তের মধ্যে ঢুকে যায়। তাই পীযূষ ভট্টাচার্যকে কোনও লাইনে দাঁড় করানো যাচ্ছে না, বারবার একক হয়ে বেরিয়ে আসছে। সমকালে থেকেও যেন কিছুটা ভবিষ্যতের দিকে তার নিঃশব্দ পদসঞ্চার।■

প্রকাশিত হয়েছে

শাশ্বতী চন্দ-র প্রথম গল্প সংকলন

পদ্মপাতায় জল

নবজন্ম প্রকাশন

অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি

পীযূষ ভট্টাচার্যের মনোগ্রাহী, হৃদয়স্পর্শী দশটি গল্প

ড. বিজিত ঘোষ

১

দেখতে দেখতে এক যুগেরও বেশি সময় পার হয়ে গেল?! অথচ মনে হয় এই তো সেদিন, সেটা ১৯৯৪-৯৫ সালের কথা। আমি তখন পশ্চিমবঙ্গে সব ক'টি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে নিয়মিত গ্রন্থ সমালোচনা করতাম। গ্রন্থ বলতে প্রধানত ছোট গল্প আর উপন্যাস। সম্ভবত সে সময়েই পীযূষ ভট্টাচার্যের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'কুশপুত্তলিকা' প্রকাশিত হয়।

আজ কুড়ি বছর ধরে আমি ছোট গল্পের গবেষণা কর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করি এই ছোট গল্পের উপর গবেষণা করেই। ১৮৯১-২০০০; ১১০ বছরের ছোট গল্পের ভিত্তিতে রচিত আমার গবেষণা গ্রন্থটিতে (বাংলা ছোট গল্পে প্রতিবাদী চেতনা) এক হাজার ছ'শ একুশটি গল্পের আলোচনা, উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে ৮০ টি গল্প নিয়ে অন্য ধারার গবেষণাগ্রন্থ 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', প্রায় ৫০০ টি সেকাল-একালের গল্প নিয়ে বারো খণ্ডের 'বাংলার ছোট গল্প', 'নির্বাচিত ছোট গল্প : নতুন আলোকে' ইত্যাদি গ্রন্থগুলির কথা আজ হয়ত অনেকেরই জানা।

এই সূত্রেই সেকাল-একালের ভাল-মন্দ হাজার হাজার গল্প নিয়মিত পড়তে হয় আমাকে। আমার এই পঠন-পাঠনের অভিজ্ঞতায় মন্দ গল্পের সংখ্যাই বেশি। ভাল গল্প কম। তার মধ্যে পীযূষ ভট্টাচার্যের প্রথম গল্পগ্রন্থটি পড়ে সে সময়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম আমি।

পরেও তাঁর অনেক গল্প, উপন্যাস পড়েছি। কিন্তু নিজের মৌলিক সৃষ্টিকর্মের কাজে ইদানীং বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তাঁকে নিয়ে আরও লেখালেখি করার সময় হয়ে ওঠেনি। নিতান্ত শারীরিক অসুস্থতা, অধ্যাপনা কর্মটি ঠিকঠাক করা আর নিজস্ব লেখালিখির চাপে, বিশেষ করে কলকাতা বইমেলার মুখে তাঁর অনেকগুলি গ্রন্থ (নিরক্ষরেখার বাইরে, উপন্যাস ও গল্পের সংকলন, প্রমা প্রকাশনী ২০০২; পদযাত্রায় একজন, এক ডজন গল্পের সংকলন, নয়া উদ্যোগ প্রকাশনী, ২০০৪; নির্বাচিত কুড়ি, কুড়িটি গল্পের সংকলন, দীপ প্রকাশন,

২০০৪; ঠাকুমার তালপাখা ও অন্যান্য গল্প, আরও এক ডজন গল্পের সংকলন, নয়া উদ্যোগ প্রকাশনী, ২০০৬) আমার হাতে এলেও সেগুলি তেমন নিবিড় অনুপুঙ্ক্ষভাবে পড়ে উঠতে পারিনি আমি; যাতে করে একটা আন্তরিক লেখা তৈরি করা যায়।

সম্ভবত আমিই প্রথম তাঁর একটি গ্রন্থ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম। পরবর্তী গ্রন্থগুলিও তেমন আলোচনার দাবি রাখে নিশ্চিত। আপাতত আমি তাঁর একটিমাত্র অসামান্য গ্রন্থ 'কুশপুত্তলিকা' নিয়ে একটি লেখা পাঠালাম। ইচ্ছে রইল, পরবর্তীকালে...।

২

'কুশপুত্তলিকা' পীযূষ ভট্টাচার্যের প্রথম গল্প সংকলন। গ্রন্থটিতে সর্বমোট দশটি গল্প আছে। প্রথম গল্পটি গ্রন্থের নাম-গল্প, কুশপুত্তলিকা। এটি একটি অসাধারণ ভাল গল্প। কাহিনী একটা আছে বটে, তবে তা এহো বাহ্য, সূক্ষ্ম গভীর ভাবনারাশি এ গল্পের সম্পদ। গল্পটি মাথা-বুদ্ধি-যুক্তি দিয়ে বুঝবার নয়, মন-হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার।

শঙ্করের দাদার বড় মেয়ে বড় বুড়ি! তার স্বামী রমেন আজ থেকে ১৬-১৭ বছর আগে 'হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল, যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, আর ফিরেও আসেনি।' রমেনের প্রেত সংসারের সন্তান-সন্ততির ক্ষতি করতে পারে ভেবে, সংস্কারবশত বড় বুড়ির বাবা রমেনের কুশপুত্তলিকা দাহের আয়োজন করেছে। অল্পবয়সী কন্যার জীবিতকালেই তার সামনে তারই নিখোঁজ স্বামীর কুশপুত্তলিকা দাহের মর্মান্তিক যন্ত্রণাকে পীযূষ গভীরভাবে ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন গোটা গল্পের শরীরে। গল্পটিতে একাধিকবার বেহুলার অনুষঙ্গ এসেছে। এই সার্থক চিত্রকল্পে বড় বুড়ির গভীর নীরব যন্ত্রণাকে চমৎকার ধরেছেন পীযূষ।

পীযূষের বলার ভঙ্গির অসাধারণ শান্ত গাম্ভীর্য গল্পটির মধ্যে অন্যতর গভীরতা এনেছে। পীযূষের প্রকাশভঙ্গির এই শান্ত গভীরতাই তাঁর গল্পের বিশিষ্ট সম্পদ। এরই পাশাপাশি বাড়তি পাওনা, মায়ামাখানো এক স্নিগ্ধ প্রকৃতির ছবি। পীযূষের ভাবনা গভীর অনুভূতি কেন্দ্রিক সেই সূক্ষ্ম অনুভবকে বহন করার যোগ্য ভাষা তিনি নির্মাণ করে নিয়েছেন। ফলে তাঁর বিষয় ভাবনা নির্বাচিত শব্দে, বাক্যে যথাযথ গভীরতা পেয়েছে। জীবনের সূক্ষ্ম, গভীর অনুভূতি, অনুভব, উপলব্ধিকে স্পর্শকাতরতার মন নিয়ে আমাদের সামনে মেলে ধরেছেন পীযূষ। উপলব্ধির নিবিড়তায় আর অনুভবের গভীরতায় 'কুশপুত্তলিকা' একটি প্রথম শ্রেণীর গল্প হয়ে উঠেছে।

'ক্ষরণ' একটি ভাল গল্প। এ গল্পেও কাহিনীর মধ্যে তেমন কোনও বিশিষ্টতা নেই। বাবার মৃত্যুর পর থেকে রীতা দাদা-বৌদির সংসারে নিঃসঙ্গ হয়েই ছিল। অবশ্য তার অন্যতর প্রাত্যহিক মানসিক যন্ত্রণা নিঃসঙ্গতার চেয়েও ভয়াবহ। কেননা, সাটু নামের এক লম্পটের দ্বারা সে ধর্ষিতা।

পূর্ববর্তী গল্পে বেহুলার চিত্রকল্প এবং এ গল্পে শকুনের প্রতীক ব্যবহারেও সবিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন পীযূষ। চমৎকার গভীর নির্বাচিত সব শব্দ সাজিয়ে অনায়াসে পীযূষ জীবনের গভীরতম সত্য কথাটি আমাদের সামনে তুলে ধরেন। তাঁর গল্পের চরিত্রবাহী

ভাবনা প্রতীকধর্মী ভাষার পিঠে চড়ে চকিতে আমাদের চেতনার অতল গভীরে নিয়ে যায়। রীতার ধর্ষিতা হওয়ার ছবিটি একটিমাত্র বাক্যে অদ্ভুত সংযমের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন তিনি। এত কম কথায়, প্রায় কিছুই না বলে সবটাই বলে নিতে পারার কৌশল বা দক্ষতা অবশ্যই প্রশংসনীয়, অনেকেই তো এমন পরিবেশের সৃষ্টি করে অথবা না করেই কিছু আদিরসাত্মক কথা বলে নেন। অথচ এমন অনিবার্য পরিবেশেও নিজেকে সংযত রেখে রুচিবান শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন পীযূষ।

গল্পের শেষটি অনবদ্য। সেই লম্পট সাটু অন্যের হাতে খুন হয়। এই সংবাদ রীতাকে অক্ষম আক্রোশে উন্মত্ত করে তোলে। পশুটাকে নিজের হাতে যোগ্য শাস্তি দিতে না পারার যন্ত্রণায়, নিজের মুখ, বুক সে নখ দিয়ে রক্তাক্ত করে। এই বাহ্যিক ক্ষরণের পাশাপাশি রীতার প্রতিক্ষণের অন্তঃক্ষরণেরও চিত্র অঙ্কনে পীযূষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

'ভাসান', 'বৈতরণী' গল্প দুটি একটু অন্য ধরনের। 'ভগ্নাংশ' গল্পটি কাহিনী প্রধান। পরিবারের কর্তা শ্রীশচন্দ্র। তাঁর ছত্রছায়াতেই বড় দুই ছেলে শঙ্খ ও শৈলেন বেড়ে উঠলেও, ছোট ছেলে শৈবাল একটু অন্য ধাঁচের। একগুঁয়ে, আত্মসুখসর্বস্ব, স্বার্থপর, অনুভূতিহীন শ্রীশচন্দ্রের পরিবারে প্রবল প্রতাপ। বড় দুই ছেলে সর্বদা বাবাকে সন্তুষ্ট করে রাখেন, পাছে তাঁর বিশাল ধনসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। ছোট ছেলে শৈবাল একদিন এ পরিবারের প্রেক্ষিতে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটায়। বাবার মুখের ওপর কথা বলে। শুধু কথা নয়, সরাসরি পিতাকে বিশ্বাসঘাতক অভিধায় ভূষিত করে। সে অভিধা অবশ্য শ্রীশচন্দ্রের যথার্থই প্রাপ্য। তার বাবার বিশ্বস্ত মক্কেল, যাকে শৈবাল 'অর্জুন কাকা' বলেই জানত, তার জমি বিক্রির বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করেন স্বয়ং শ্রীশচন্দ্র। ফলে এক্ষেত্রে শৈবালের প্রতিবাদ একান্তই যুক্তিযুক্ত।

শৈবালের মতো প্রতিবাদী চরিত্র—স্বয়ং পিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা প্রসঙ্গে জগদীশ গুপ্তের 'পয়োমুখম' গল্পটির কথা মনে পড়ে। এখানে পুত্রের প্রতিবাদে মানসিক আঘাত পেয়ে মৃত্যু ঘটে শ্রীশচন্দ্রের। আর ওখানে পিতা কৃষ্ণকান্তকে আত্মহত্যার পরামর্শ দেয় পুত্র ভূতনাথ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথের 'হালদার গোষ্ঠী' গল্পটিও।

'জরি' একটি ভাল সাংকেতিক গল্প। হিরন্ময় ডাক্তারের বৌ সুষমাকে নিয়ে পালিয়েছে ডাক্তারেরই এক মামাতো ভাই অতুল। সুষমার প্রথম বাচ্চাটি তিন মাস পেটে থাকতেই নষ্ট হয়ে যায়। এদিকে ভাটার মালিক হঠাৎ বড়লোক হওয়া রসিক মাধু ঘোষ একদিন এসে দেখে, সুমন্ত ডাক্তারের পাঞ্জাবির পকেটে এবং তার শরীরের এদিকে ওদিকে অসংখ্য ইঁদুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইঁদুরে মধু ঘোষের খুব ভয়। সে শুনেছে এই সব খুদে ইঁদুরেরা মানুষের চোখ পর্যন্ত খেয়ে নেয়। এমন সময় মধু ঘোষের পকেট থেকেও একটা ইঁদুর তার সামনে এসে পড়ে। সে আঁতকে ওঠে। ইঁদুরে মধুর এত ভয় কেন? আসলে ইঁদুরের প্রতীক আমাদের পৌঁছে দেয় আর এক ভয়ঙ্কর সত্যে। গর্ভাবস্থায় তিন মাসের শিশুর আকৃতি ঠিক ইঁদুরের মতোই থাকে। আর মধু ঘোষের ভাটার মিস্ত্রির মেয়ে ফুলিরও এখন তিন মাস। তাই কি মধু ঘোষের ইঁদুরে আতঙ্ক? প্রসঙ্গত সোমেন চন্দের অনন্য সাধারণ 'ইঁদুর' গল্পটির কথা আমাদের

মনে পড়ে যায়।

'চক্ষুদান' একটা ভাল মনস্তত্ত্বসম্মত গল্প। নিজের হারানো আংটি উদ্ধারের জন্যে মানিককে পুকুরে নামিয়েছিলেন সত্যেন। সে পুকুর থেকে মানিক আর ওঠেনি। সেই অপরাধবোধের নিত্য যন্ত্রণা সত্যেন চরিত্রটিকে জীবন্ত করেছে।

পরিশেষে শুধু একটা কথাই বলব : পীযূষের গল্পে মাঝেমধ্যেই অকারণ অনুপুঙ্ক্ষ বর্ণনার প্রবণতা একটু ক্লান্তি আনে। এটুকু বাদ দিলে পীযূষকে শক্তিমান গল্পকার না বলার কোনও কারণ নেই।■

সংগ্রহে রাখার মতো তুষার চট্টোপাধ্যায়ের কিছু বই

গল্পগ্রন্থ
■একালের এ গল্প
■ইজিচেয়ার
■কুশপুত্তলিকা
■নির্বাচিত গল্প
■আইলিড কাকুর গল্প
■প্রিয় গল্প

ফিচার রম্যরচনা
■গোপন ডায়েরি
■কিছু মুক্তগদ্য

উপন্যাস
■অনুপ্রবেশ
■বিপন্ন
■মুখোশ
■শূন্যবলয়ে
■চেনা অচেনা মুখ
■গোপন ব্যথা
■অন্তর্ঘাত

নাটক
■কালো হাত
■জীবনটা এখন গরুর গাড়ি

প্রাপ্তিস্থান
বইওয়ালা, ১৪৯ ক্যানেল স্ট্রিট, কলকাতা-৪৮
এবং বইওয়ালা, স্টেশন রোড, আলিপুরদুয়ার কোর্ট

সংকট ও সংকটমোচনের আখ্যান

রম্যপ্রসাদ নাগ

কথা সাহিত্যিক দেবেশ রায় বিজিতকুমার দত্ত স্মারক বক্তৃতায় বাংলা কথা সাহিত্যের উল্লেখ্য কয়েকটি দিক নিয়ে ইঙ্গিতগর্ভ আলোচনা করেন। আলোচ্য বিষয়বস্তুতে সমষ্টি থেকে সংকট আর সংকট থেকে সমষ্টি এই দুটি গুচ্ছে বিভক্ত বাংলা উপন্যাসের আলোচনার সাথে সাথে সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস যে আধুনিক রচনা রীতির অন্যতম প্রধান প্রসঙ্গ হয়ে উঠতে পেরেছে তার উল্লেখ ছিল। সেখানে উল্লেখিত বাংলা উপন্যাস 'সম্ভবত' একটি দৈব গতিবেগ' অর্জনে অগ্রগামী, এমত সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা-যোগ্য বলে মনে হতে পারে। 'দৈব' শব্দটির আভিধানিক শব্দার্থ গ্রহণ এক্ষেত্রে অভিপ্রেত নয়। বরঞ্চ সময়ের সামগ্রিক উপলব্ধি কথাটি বেশি যুক্তিযুক্ত। 'সম্ভবত' শব্দটি প্রয়োগ করে দেবেশ অবশ্য একটি নীরবতার অবকাশ পূর্বেই তৈরি করে রাখেন। বাংলা উপন্যাসের পরিপূর্ণতার সময়বৃত্তে আধুনিক মাত্রাটি আর ব্যক্তিক হয়ে নেই, বরঞ্চ তাকে সামূহিক বলে ভাবা যেতে পারে। প্রধানতম ধ্রুবক হিসেবে অন্যান্য কয়েকটি অনুষঙ্গের সাথে একে পাঠক গ্রহণ করে নিয়েছেন। দেবেশের আলোচনায় বাংলা উপন্যাসের মূল ক্ষেত্রটি তাই সমষ্টি থেকে সংকটের বিচরণ ক্ষেত্র অথবা সংকট থেকে সমষ্টির কথা নামে চিহ্নিত হয়েছে। আবার কোথাও বা সমষ্টি ও সংকটের নিষ্পন্ন পরিণতি ধ্বংসকে স্বীকৃতি জানানোর কথা আছে।

নিবন্ধ প্রারম্ভে প্রসঙ্গটি স্মরণ করার কারণ কথা সাহিত্যিক পীযূষ ভট্টাচার্যর রচনা বিশ্লেষণে আলোচনার এই অভিমুখটি ব্যবহার অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। 'জীবিসঞ্চার' নামক উপন্যাসিকাটি পীযূষ ভট্টাচার্য লিখেছেন বেশ কয়েক বছর আগে। প্রকৃতপক্ষে রচনাটি জীবন সঞ্চারের কাহিনী। একজনের আয়ু অন্যজনে সঞ্চারমান হবার অলৌকিক কথা। লৌকিক অভিচারের মধ্যে মানুষের বাঁচার আকাঙ্ক্ষার কথা। আখ্যান মুখ্য জীবিসঞ্চার পদ্ধতিটি জটিল মনস্তাত্ত্বিক আবহের তির্যকতায় বহুব্রজী। নিজের ন্যারেটিভের এক বিপরীত ভাবনাকে উপস্থাপিত করে উঠতে চান লেখক। অনধিক চল্লিশ পৃষ্ঠার আখ্যান তিনটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বের শিরোনাম 'নিদ্রা কাহারে বলি জাগে কোন জন'। পর্বটি কুসংস্কারে আচ্ছন্নতার প্রতিবেদন। যৌনতা এবং রিরংসা প্রবল হয়ে ওঠে এখানে। দ্বিতীয় পর্ব 'পর্বান্তর' দামিনী পুত্র সুবলের রেজারেকশনের আকল্প। তৃতীয় পর্ব 'পর্বান্তরের পরে' সুবলের প্রতিবাদ ও

তারাপদর বিনষ্টির কথা। শরবিদ্ধ রমণ দর্শনের ধাক্কায় পাঠক সচকিত হয়ে ওঠেন। প্রতিবেদন শেষে শূন্য থেকে নেমে আসে ধ্বংসের মহাপ্রলয়। 'দৃপ্ত হিংসায় পিস্তলের নল তারাপদকে স্পর্শ করে।' ধ্বংসের ও জীবনের ভিন্নতর এক আকাশে তারাপদর জেগে ওঠা চিহ্নিত হয়ে যায়। 'মানুষ সর্বদাই ইতিহাস সিঞ্চিত' হয়ে থাকে এই বাক্যটি স্বতঃসিদ্ধ হলে ইতিকথা প্রকৃতপক্ষে সমষ্টির কথা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রতিবাদী সুবলের উচ্চারণে জানিয়ে দিলেন লেখক, মানুষ দেখাতে পারলে সুবলও দেবতা দেখাবে। অন্ধকার বুনটের ভেতরে সে দামিনী মাকে চলে যাবার আশ্বাস-মন্ত্র শোনায়। জামতলির বেশ্যাপাড়ায় গুপিচন্দ্র রাজা সুবল চওড়া কাঁধ, লোমশ বুক নিয়ে একাই বালতি ভরতি জলে দু হাতে পৃথিবীর ক্লেদ সরিয়ে দেয়। মাতৃকলঙ্কের দায়ভার একা বহন করে মিথিক্যাল প্রতিকৃতি সুবল অন্তিম প্রতিবাদী জাগরণের কথা শোনাতে থাকে। এখানেই ব্যক্তি থেকে সমষ্টি। সুবল তখন আর ব্যক্তিক অস্তিত্ব হয়ে থাকে না।

লেখক সমগ্র আখ্যানে একটি রহস্যময়তার আবরণ সচেতনভাবে রেখে দিয়েছেন। তাঁর লিখন বৈশিষ্ট্য জারিত এই অস্পষ্টতা প্রাচীনতা এবং বর্তমানের বৃত্তে একটি অধরা ভাব বহন করে নিয়ে আসে। লেখকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি ধারণা এখান থেকে সৃষ্টি হয়। পীযূষ লেখেন, 'মানুষের সাধারণ বাস্তবতা থেকে মিথ্যা, আত্মবিস্মৃতিপরায়ণতা ও যথাযথ মিথ্যাকে সত্যের অনেক নিকটতম' বলে মনে হয়। এই মনে হওয়াটাই আসল কথা। সৃষ্টির মূল কথা হল বিভ্রম তৈরি করা। উপন্যাসিকাটির অন্যতম চরিত্র রাজনৈতিক ক্ষমতালোভী তারাপদ জীবিসঞ্চার প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করতে গিয়ে মাখন গুণিনের কমলা রঙের চাপা আগুনের পিছে হেঁটে চলে যেতে থাকেন। আকাশে ছেড়ে দেওয়া মন্ত্রপূত পায়রারা উড়তে থাকলে জামতলির বেশ্যাপাড়ায় বিন্দাকে জানিয়ে দেন যে সে রাতে তিনি নিজেই পাখি হয়ে উড়ে গিয়েছিলেন। অলৌকিকতার একটি কোলাজ গঠিত হতে আরম্ভ করল। তা আরও বৃদ্ধি পেল ধ্বংসস্তূপের নির্জনতার মধ্যে। নুপূরের যৌনতাজ্ঞাপক ধ্বনিতে। বিশ্বাসঘাতকতা এবং গভীর হিংস্রতার রিরংসার মধ্যে। বিভ্রমের চরম ক্ষণটিতে জামতলির বিন্দা আদিম হয়ে আত্মপ্রকাশ করল। সুবলের মুখে ধ্বনিত হল 'আবা আবা' সুর। বাস্তব এবং কল্পনা মিলেমিশে একাকার। পাঠক একটি ভাবোদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় নীত হয়ে যান। বর্ণনার প্রায় কাছাকাছি অর্থগত বিষয় উদ্ভাবনে প্রেরণা পেতে থাকেন। এক ধরনের বিরোধাভাসের মধ্যে যথার্থ অর্থটি তার কাছে স্পষ্ট হয়।

তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, অসাধারণ দক্ষ কুশলী বিশ্লেষণের ইঙ্গিত দিয়ে পীযূষ অলৌকিকতা থেকে সরে গিয়ে আখ্যানকে বাস্তবের ফ্রেমবন্দি করে তুলতে চান। কল্লোল যুগ থেকে বাংলা রচনায় যৌনতাকে যেভাবে সাহিত্যিকরা ব্যবহার করা শুরু করেছিলেন পীযূষ সেভাবে তাঁর রচনায় যৌনতাকে লিপিবদ্ধ করেন না। তাঁর প্রয়োগে লৌকিক উপাদান থেকে যায়। ইমপ্রেশনিস্টদের মতো সে প্রয়োগ থেকে ভিন্নতর অর্থ উঠে আসে। ন' বৌদির শরীরের মৌতাতে তারাপদ ভেসে যায়। বৌদির পায়ের মলের শব্দ যেন তার সুপ্ত কামপ্রবৃত্তির প্রকাশ্যে উঠে আসার শব্দ। বন্ধ দরজার অন্তরালে দাদা ভানুপদর কামলীলার গোপন অবলোকন তাকে তৃপ্ত করে না। তাই তারাপদ মানুষের গন্ধে 'বেঁচে থাকার বীজ'-কে

উপলব্ধি করে। জামতলির বিন্দার ঘরে এই গন্ধ থাকে। কামশীতল সুবর্ণের শরীরে এই গন্ধ অনুপস্থিত। তাই প্রতিবার সহবাস শেষে তাকে ধারাস্নানে স্নাত হতে হয়। ন' বৌদি অতৃপ্ত লিবিডোর তাড়নায় দক্ষিণের যমুনা দহতে ডুব সাঁতার দিয়ে চলে। শরীরে জড়িয়ে থাকে আঁশটে মাছের গন্ধ। জলাশয় অনুষঙ্গে গভীরতা এবং মৎসকন্যা অনুষঙ্গে লৌকিক উপাদান মিশে গিয়ে যৌনতাকে একটি বিমূর্ত কাব্যিক রূপময়তার বৈশিষ্ট্য দান করেছে। ব্যক্তিক অনুভূতি তখন একটি সমষ্টিগত অর্থক্ষেত্রের প্রতি প্রবাহিত হয়। বুভুক্ষু সুবল আখ্যান অংশে ধর্ষিতা দামিনীর আঙ্গুল আঁকড়ে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য বলেছিল–'বাপ আসলি, হামরাও চলি যামো'। ব্যক্তির সংকট চিহ্নটি তখন আর অনাবিষ্কৃত থাকে না। একক সংকট অন্য অর্থে বহুর উপলব্ধি। তাকে ভিন্নতর তরঙ্গে উত্তরিত করে দিতে লেখক সচেতনভাবে রহস্যময়তার আবরণ প্রদান করেছেন। প্রাচীনতার গূঢ় বর্মে আচ্ছাদিত করে দিলে মিথ ভেঙে উচ্চারিত হয় 'বহু আলোকবর্ষ পেরিয়ে কোনো নক্ষত্রের আলো, পায়রার পাখনার ছায়া পৃথিবীতে পড়বার কথা নয়।'

তারাপদর বিনষ্টি কিংবা সুবলের অন্তিম প্রত্যাশা যেমন সংকটের একটি প্রান্ত, অন্য প্রান্তে সেই বদ্ধতাকে অতিক্রম করে যেতে চান লেখক। মার্কসবাদী দর্শনে আবাল্য বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে কোথায় যেন একটি ধীরবাদী রক্ষণশীলতাও কাজ করে চলে। সনাতনী সংস্কার তাঁকে প্রায়শই কোনও নস্টালজিক রোমান্টিকতার কাছে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকা পরিবর্তনের সাথে সাথে তাঁর আঙ্গিকে এসে গেছে পুরনো ভাষার অন্তর্নিহিত নব ভাষার সংবেদনশীলতা। ভাষার বাক্যবন্ধ ওলটপালট করে নয়, তাঁর অন্তরালে সাহিত্যিক নৈর্ব্যক্তিকতা এবং ইঙ্গিতের দ্যোতনা প্রোথিত করে দিয়ে তিনি তাকে চিত্রকল্পময় এবং বহুবিধ মাত্রাসম্পন্ন করে তোলেন। শিল্পের ক্ষেত্রে 'ফেনোমেনাল রিগ্রেশন' নামে একটি অভিধা প্রচলিত আছে। শিল্পীর চোখে দেখা বাস্তব, শিল্পের বাস্তবের চাইতে স্বতন্ত্র। শিল্প বাস্তবতায় বহুস্তরের অভিজ্ঞতা ও মাত্রা একে অন্যের সাথে জড়িয়ে থাকে। তাই রাজনীতি ও ধর্মের বৃত্ত আবদ্ধ মানবিকতার সংকট সাহিত্যের আখ্যানকর্মে মূল বিষয়বস্তু হতে পারে। এই সংকটকেই ভাষারূপ দান করেছেন পীযূষ।

সামাজিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল ভুবন, দামিনী ও সখারাম। তারা সবাই ব্যর্থ হয়। এক অশরীরী দুঃখময়তায় দামিনী সুবলের জন্য উন্মাদিনী হয়ে ছুটলেও 'মৃত্যুর গন্ধের মধ্যে আচ্ছন্নের মত স্থির দাঁড়িয়ে' থাকে। আর সুবল সংকট মোচনে অতীতে পাখির ডাকের মতো কাঁদলেও আখ্যান পরিশেষে দৃপ্ত মেঘের মতো রুখে দাঁড়ায়। মিথোচারিতার বিরুদ্ধে। তন্ত্রসাধনার গুহ্যক্রিয়া, যুগী সম্প্রদায়ের তন্ত্রাচার ও চর্যাপদের সহজিয়া বৌদ্ধসাধকের গূঢ়াচার, 'জীবিসঞ্চার' আখ্যানের বাস্তবতাকে বহুধা মাত্রা অর্জনে এগিয়ে নিয়ে গেছে। অন্যত্র একই বৃত্তে অবস্থান করে বাচ্চু মিঞা। আকাশের রাত জাগা নক্ষত্রকে পথপ্রদর্শক মেনে হাজি সাহেবের মেজবিবিকে সঙ্গী করে সে যাত্রা শুরু করে। তার কানে ভেসে আসে বহুদূর সামুদ্রিক শঙ্খর পবিত্র গর্ভধারণ আকাঙ্ক্ষা। 'নিরক্ষরেখার বাইরে' রচনাটিতে সংকটের পরিণতি আগের রচনাকর্ম থেকে অধিকতর স্পষ্ট। বাচ্চু মিঞার ব্যক্তিক উপলব্ধি থেকে সরে গিয়ে লেখক পাঠককে জানিয়ে দিলেন যে

এক নিরাকার শূন্যতা বর্তমানের অবধারিত ভবিতব্য। শূন্যতা জন্ম নিয়ে প্রস্থান করে আরও বেশি শূন্য এক পৃথিবীর দিকে। আক্রান্ত ও আক্রমণকারীর মধ্যবর্তী মহিন্ন যন্ত্রণা এখন সংবাদ। ফুলমণি ধর্ষিতা হলে দিশাহীন অস্তিত্ব বুকে মঙ্গল হাঁসদা তার সাক্ষী হয়ে থাকেন। ফুলি আত্মঘাতী হতে বাধ্য হলে সুনন্দা প্রাক-আর্য বাংলার জনজীবনের 'এপিস্টেমে' আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। সংকটকে মান্যতা দিতে গিয়ে লেখক আখ্যান বস্তুর অন্তরালে ধ্বনিত করেছেন এক ইঙ্গিতময় 'রিফ্রেইন'। 'নিরক্ষরেখার বাইরে' রচনায় তা হল ভাসানের সুর। পুঁতির মায়ের কণ্ঠে সে সুরে স্পষ্টতা ছিল বেদনার। 'ক্ষণে বৈধব্যি রে গদা, ক্ষণে বৈধব্যি রে' স্পষ্টতা না পেলেও ভাসানে স্বামী-সন্তান হারিয়ে পুঁতির মা স্রোতের টানে ভেসে চলে ভূগোলের গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্য এক ভূগোলে। মৃত্যুর মুহূর্তে পৌঁছে জীবন জীবনের মতো হতে পারে। এই সংকট ও উত্তরণ পীযূষের জীবনবোধ। সেখানে একাকীত্ব যে অসম্পূর্ণতার কথা বলে, তাকে প্রত্যক্ষ করে, সেই প্রত্যক্ষতার ভেতর সন্ধ্যা থেকে রাত্রির দিকে ছুটে যায় এক-একটি দিন। জীবন হয়ে ওঠে অহেতুক এক জীবনবৃত্তান্ত। তার যাদুস্পর্শে এমন পরিবর্তন বোধগম্যতার বাইরে থেকে যায়। বাচ্চু মিঞা নিরক্ষরেখার মতো জীবনের নিয়মকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। হানিফ ইরানি দেখেছিল একটা দিনের মরে যাওয়া আকাশের রং। সেখানে করুণভাবে চাঁদের উপস্থিতি। ফুলির মৃতদেহের নগ্নতার ভেতরে সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছিল অচেনা এক অন্ধকার। এক ভিন্নতর বাস্তব। সংকট নিষ্পন্ন পরিণতিটি এখানে উপস্থিত। বাচ্চু মিঞা কুলসুমকে সাথে করে পীর মোল্লা আতার সুড়ঙ্গে লুকিয়ে পড়ার কথা ভেবেছিল। সেখানে একটি জনপদ লুকিয়ে থাকার কথা, যার মুখটি সে কখনও দেখতে পায়নি। সভ্যতার সেই অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বাচ্চু মিঞারা ছোট হতে হতে একদিন মিলিয়ে যাবে।

সংকটের বৃত্তটিকে লেখালিখিতে স্পষ্ট করার প্রয়াস পীযূষ সত্তরের দশকে শুরু করেছিলেন। আবদ্ধ মানুষকে জানার অদম্য ইচ্ছা নানা সময়ে নানাভাবে প্রকাশিত হতে পেরেছে। সামাজিক জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে কবিতায় প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি লেখেন, 'দিনগুলি/ আইবুড়ো মেয়ের সোহাগী বেড়ালের মতো/ কেটে যায়।/ আর আমার ভায়ের রক্ত/ আমার সাথে কথা বলে/ আমি ঘুমিয়ে থাকি।/ বাসি মৃতদেহ ঘিরে/ মাছিদের গুঞ্জরণ/ রক্তময় শরীরে আমি মৃত' (ভীষণ মহিন্ন অসুখ)। বাস্তবের প্রতি দায়বদ্ধতা কমিউনিজমে যেমন আকর্ষিত করেছিল, সেরকম সত্তরের রক্তক্ষয়ী রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও একই সাথে একটি অন্তর্বিরোধের সম্ভাবনাকে জাগ্রত করে তুলেছিল। আবেগ-অনুভূতির ব্যক্তিক জাগরণকে তিনি বিস্মৃত করে দিয়েছেন স্বদেশের সামূহিক পর্বের মাঝে। আপাতদৃষ্টিতে কখনও মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে তাঁর সাহিত্যিক বাস্তববোধ নিজের রাজনৈতিক মতামতকে অতিক্রম করার প্রয়াস পেয়েছে। সময়ের প্রবৃদ্ধি মানুষকে অনেক বেশি করে মূল্যবোধহীন ও ক্ষমতাবান করে ফেলে। 'গারসি সংক্রান্তির কাক' গল্পে জলবিষুব সংক্রান্তির দিন ত্রিকালদর্শী কাকের পূর্বপুরুষের উদ্দেশে নিবেদিত ঘি-ভাত খেয়ে যাবার মধ্যে কি মুক্তির স্বপ্নে প্রত্যাবর্তন লুকিয়ে থাকে না? মানিকের মাথার মধ্যে তেইশ বছর ধরে গেঁথে থাকা গুলিটা হঠাৎ একদিন পাশের জনকেও মৃত বানিয়ে দিতে পারে। কাকটি ভীষণ দর্শন অন্ধকার হয়ে গেলে দেশজ বৃত্তে ফিরে আসার ঘোষণা রাখেন লেখক। ব্যর্থতার মধ্যে এটুকুই হয়ত

বাঁচার উপকরণ। দেশজ মেরুকরণের এই পর্বে হয়ত বা ভাববাদী প্রাধান্য। কারণ লেখক জানেন অনন্ত পথ পরিক্রমায় কালগর্ভে বিলীন হওয়া নিশ্চিতপ্রায়। 'অন্তরীক্ষে জলে স্থলে কোন অবরোধ নেই/ অথচ পিশাচ সিদ্ধ সময় গিলে খায় সময়কেই' (অন্তরীক্ষে জলে স্থলে)। তার ভেতরে ব্যক্তি আমির মুক্তি চলে নিরবধি। ঘটনা ও বোধের সংঘাতে লেখকের মধ্যে অন্য একটি বোধের জন্ম হয়। সাহিত্যে তার প্রকাশ অনিবার্য।

ব্যক্তিগত অনুভব আর স্বকীয় ভাষাশৈলীকে অবলম্বন করে সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টি হয়। দিনযাপনের প্রাত্যহিকে চেতনার পরিমাপ হয়ে চলে অনুক্ষণ। ব্যক্তিগত জীবন যতটা সংকটের মুখোমুখি হয়, অন্তর্বর্তী চেতনা ততই তাকে ঋদ্ধ করে দেয়। পীযূষের 'কীর্তিমুখ' গল্পটি স্মরণ করা যাক। শান্তনু বুঝে উঠতে পারে না জমি দখলের লড়াই করতে গিয়ে জোতদার হারু ঘোষকে বল্লম ছুঁড়ে বিদ্ধ করে ফেললে তা ব্যক্তিহত্যা না শ্রেণীসংগ্রাম নামে পরিচিত হবে। এই দ্বন্দ্বে আবর্তিত হতে থেকে সে ফিরে আসে নিজের সংসারের বৃত্তে। এটি তার ব্যক্তিক সংকট। সেখানে তখন ভাঙনের খেলা। গীতি এবং ঝুলনের অধিকার রাজনৈতিক কায়েমি স্বার্থ অস্বীকার করে নিতে বাধ্য করেছে। বাস্তব পরিস্থিতির প্রতিকূলতায় আত্মনিপীড়নের আপস শান্তনুকে গ্রাহ্য করে নিতে হয়। নিঃসঙ্গ দহনে নিজেকে ক্রূরতায় ধ্বংস করা তার অবধারিত নিয়তি। কীর্তিমুখের মতো। সংকট নিষ্পন্ন ধ্বংসের মাত্রাটিকে লেখক স্পষ্ট করে দিয়েছেন ইঙ্গিতবাহী পুরাকাহিনীর আভাস এনে দিয়ে। শান্তনুর সংগ্রহে ছিল প্রাচীন পাথরের মূর্তির ওপরে একটি কীর্তিমুখ অংশ। জীবনের জীবন সংহার করে বেঁচে থাকার রূপক। পার্বতীকে এক দানব কামনা করলে শিব তাকে বধ করার জন্য অন্য এক দানব সৃষ্টি করেছিলেন। এদিকে প্রথম দানব নিজের ভুল বুঝতে পেরে শিবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ক্ষমা প্রাপ্ত হন। কিন্তু দ্বিতীয় দানব তার সৃষ্টির শর্ত অনুযায়ী খাদ্য প্রার্থনা করে। বাধ্য হয়ে শিব তখন তাকে নিজেই নিজেকে খেয়ে ফেলার আদেশ দিলেন। 'নিজের পা থেকে খেতে খেতে ওপরের দিকে উঠতে উঠতে মুখ ছাড়া কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।' একে কীর্তিমুখ বলে। এই চিত্রকল্পটি জীবনের অনিবার্যতাকে ব্যক্ত করে। মহাদেব এই মুখের দিকে তাকিয়ে জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এর চাইতে বড় উদাহরণ আর হয় না বলেছিলেন। সত্তরের দশকের রাজনৈতিক বিশ্বাস প্রায় এক দশক পর যে অবিশ্বাস এবং হতাশার জন্ম দিয়েছিল কীর্তিমুখ তার বোবাকান্না হয়ে রয়ে গেল অনাগতের উদ্দেশ্যে। এখানে সংকটের মাত্রাটি সমষ্টি থেকে ব্যক্তিক।

আশির দশক থেকে নিয়মিত লেখালিখিতে চলে এসে লেখক বারে বারে আত্মসমীক্ষা চালিয়েছেন, 'কাহিনীর বয়ান জীবনের বাঁকে বাঁকে চূর্ণ হয়ে যে বীক্ষণ তৈরী করে' জীবনবোধের সেই বহুমুখিনতাকে আখ্যান অংশে ধারণ করতে চেয়েছেন। রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার ও দুর্বৃত্তায়ন থেকে অন্ত আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট ছিল। চোদ্দ-পনের বছরের ব্যবধানে কত কিছু বদলে যায়। সামন্ততন্ত্রের টার্গেট অন্ত লড়াইয়ের ময়দান পরিহার করে রোমান্টিকতার মধ্যে আশ্রয় সন্ধান করে। 'আত্মরক্ষা' গল্পে অন্ত ইভাকে অবলম্বন করে বাঁচতে চায়। সুস্থ অঙ্গীকারের স্বর্গে ফিরে যেতে চায়। অথচ বৃষ্টির ফোঁটা শব্দভেদী বাণের মতো নিক্ষিপ্ত হলে জ্যা মুক্ত প্রতিটি বৃষ্টির শব্দ সামাজিক পরিস্থিতির টেনশনটিকে চিত্রিত

করে দেয়। 'মাধ্যাকর্ষণের কোনও এক মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়া এক শূন্যতার মধ্যে।' ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই নিঃস্বতা একটি সামগ্রিক প্রতিফলন। ট্রাকের ক্রুদ্ধ গর্জন, নীল বিদ্যুতের আলোর ঝলক জানালা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে অন্তর্লীন হলে ইভা ও অন্তর দুজনারই মনে হতে পারে 'কত দিন বৃষ্টিতে ভেজা হয়নি।'

অধিকাংশ গল্পের ডিসকোর্সে পীযূষ ধারণ করে রাখেন এক ক্ষয়িষ্ণুতার ছবি। বুঝি বা পক্ষপাতের ছবিও। স্পষ্ট চিত্রে থাকে ইতিহাসের অগ্রগামী শক্তিকে গ্রাহ্য করে নিয়ে প্রাচীনতার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব। স্বগত কথনের মধ্যে দিয়ে অবচেতনার স্রোতে নিমজ্জমান হবার চিত্রগুলি মোটেই অস্পষ্ট থাকে না। লেখকের রাজনীতি বোধ এর পশ্চাতে ক্রিয়াশীল বলে মনে হয়। আত্রেয়ী নদী তীরবর্তী বালুরঘাট, রংপুরের নীলফামারি হয়ে আবার আত্রেয়ী, পুনর্ভবা, টাঙ্গন নদীর তীর লেখককে তাঁর বোধে ক্রমান্বিত হতে সাহায্য করেছে। প্রায় কৈশোরেই হিলি মেল ডাকাতির অন্যতম সদস্যের প্রভাবে দেখে নিয়েছিলেন এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল আর তার সুপ্ত সংগ্রামী চেতনাকে। পাড়ানি আন্দোলন, তোলাগণ্ডি আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, আরও কত বিদ্রোহের পরিচয় সেখানকার মৃত্তিকায়। দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠে দাঁড়িয়ে রোদ বা জ্যোৎস্নার ছায়ায় স্পষ্ট হয়েছে শহিদের স্মৃতি। সেই অলৌকিক ছায়ার মধ্যে থেকে যে সৃষ্টি তাতে অলৌকিকতা বা রহস্যময়তা থাকাটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। জীবনের বহুমুখিনতার মধ্যে এক সংকটের আবর্তে থেকে গিয়ে এবং তা থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়ে রচিত হয়ে চলেছে তাঁর সাহিত্যকর্ম। লিপিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে দ্রুত বদলে যাওয়া সামাজিক বাস্তবতা। ক্রমদৃশ্যমান জটিলতায় আক্রান্ত হতে থাকে আখ্যান বিষয়।

কৃষি ভিত্তিক সমাজে কর্ষণের আদি প্রতীক লিঙ্গ। তাকে প্রাচীন আচারের আবরণে তুলে আনেন লেখক 'বোধনপর্ব' গল্পে। চণ্ড আকাশের নিচে বাংকা বম্মন কালীর মুখোশের আড়ালে শূন্য মাঠে একাকী বৃক্ষের মতো জেগে থাকে। আগুনের হলকার মধ্যে স্থির থাকে। গোখরোর গন্ধ নাকে নিয়ে রিভার লিফটের সেচহীন এক অলৌকিক মৃত্তিকায় উপস্থিত হয় যেখানে কয়েজন উলঙ্গ নারীর জল প্রার্থনা শুধু। 'হুদুম দ্যাও' বোধনে নারীর উপস্থিতি গ্রাহ্য, পুরুষ উপস্থিতি নিষিদ্ধ। প্রাচীনতাকে লৌকিক পটভূমির সাথে সংযুক্ত করে দিলেন লেখক। খণ্ডিত ছবির মধ্যে দিয়ে একই সাথে উঠে এল সংকট ও সংকট মুক্তির সম্ভাবনাটি। ভারী তলপেট নিয়ে উলঙ্গ চিন্তা এলোচুলে বাংকাকে দেবী মূর্তি ভেবে নিয়েছিল। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের শূন্য মাঠে দাঁড়িয়েছিল বর্গা রেকর্ড বা মালিকানা স্বত্বহীন কালীর মোখা পরা বাংকা। ঘাঘরার নিচে প্যান্ট, প্যান্টের চোরা পকেট, যেখানে পুরুষাঙ্গ ছুঁয়ে বিড়ি-ম্যাচে থেকে যায় শোষিতের প্রেক্ষাপট। তার কাছে আকাশটা তো চিরকালই শূন্য। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন চেয়ে আদিম নারীনৃত্যের বৃত্তে প্রবেশ করে সে। কুসংস্কারের বাস্তবতা নিয়ে গল্পটি সংকট সমাধানের পথে এগিয়ে যায়। তাই অন্তিমে মাথার ওপর ঝুলে থাকে প্রবল বৃষ্টির ইঙ্গিত। থেকে যায় প্রবল বৃষ্টিতে তালগোল পাকিয়ে যাবার আশঙ্কা।

পীযূষ ভট্টাচার্যর কথা সাহিত্যে দিনাজপুর অঞ্চলের কথা বেশি করে এসে যায়। অধিকাংশ আখ্যান আলোড়িত হয়েছে এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। প্রসঙ্গটি লেখক নিজেও জানেন।

স্বীকৃতি জানিয়ে বলেছেন, 'বলা যেতে পারে আত্রেয়ী, পুনর্ভবা ও টাঙ্গন তিন নদী, এক বেণীর যুবতী হয়ে রঙ্গ করে। যেন এক বেণীর রমণীর অবয়ব তৈরি হয়েছে, তাকে নিয়েই ঘর করি। গোপন ষড়যন্ত্রে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প থেকে এই সব নদীকে ছেঁটে ফেলা হোক না কেন, প্রতিদিনই ভাবি, অপেক্ষায় থাকি নদীতে পদ্ম ফুটে উঠুক, মধুবনীর নকশা হয়ে উঠুক।' প্রথম জীবনের রাজনীতি তাকে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পেরেছিল। আঞ্চলিক চিত্র, বিভাষা সব নিয়ে তাঁর লেখালিখি এক অর্থে উত্তরের সাহিত্য অন্য অর্থে জীবন বা অস্তিত্বের অর্থ অনুসন্ধান। সেখানে প্রতিনিয়ত ঘটে যায় ব্যক্তি আমির মোক্ষণ। যে সত্য মানুষকে জীবনযাপনে সাহায্য করে, জীবনের নানা রহস্য উদ্‌ঘাটন করে, মিথের পাঠ নিয়ে এক ধরনের জীবনবোধ সৃষ্টি করে, তার অনিবার্য প্রকাশ সাহিত্য। সামাজিক সত্যনিষ্ঠার পরিচয় ব্যক্ত করে। আর সমাপ্তিবিন্দু হিসেবে জাগরিত হয়ে থাকে মানবিকতা। মানুষের হৃদয়বৃত্তি। বলতে কোনও সংকোচ নেই এই অঞ্চলজাত বেদনাবস্তুটি তাঁর আখ্যান কর্মে সংকটের অন্য একটি মাত্রাকে ধ্বনিত করে তোলে। উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক জনজীবন উন্নয়নের গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি। লাঞ্ছনা ও অপমানের সংকট হেঁটে যায় এক অনন্ত নেতির মধ্যে। দেশভাগ এই অঞ্চলকে আরও অধিক ক্রম অবলুপ্তির কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে তুলেছে। সর্বোপরি প্রতিনায়ক হয়ে থাকে সময়। অতি প্রাচীন পরম্পরা এবং আধুনিক সময় এই দুয়ের পারস্পরিক দ্বন্দ্বে আখ্যানে তৈরি হয় 'ইন্টার টেক্সচুয়ালিটি'। আবার ব্যাপক অর্থে এ শুধু উত্তরের নয়, নিখিল মানবের অমোঘ বিষাক্ত বাস্তব।

'শূন্য কফিন অথবা মৃতের হাঁটবার গল্প' এক দীর্ঘ ছায়ার আখ্যান। সেই ছায়ায় স্তব্ধ হয়ে থাকে সাকিনার কফিন। দুলাভাইয়ের সাথে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে যেতে গিয়ে যাকে বি এস এফের গুলিতে লাশ হয়ে যেতে হয়েছিল। একটি অস্বস্তিকর নীরবতার মাঝে সেখানে মাথা ও পায়ের নিচে শূন্যস্থান থেকে যায়। এই শূন্যতা রাখাটাই হয়ত নিয়ম। রাজনৈতিক নিষ্পেষণের অভিজ্ঞতা থেকে সংকটের সূচনামুখটি জন্ম নিলেও লেখক দুর্দশামোচনে যেভাবে যাদুবাস্তবতার প্রয়োগ করেছেন তাতে সময়ের জটিলতা থেকে প্রস্থান শুধুমাত্র। স্বরক্ষেপের ঐকিকতাকে ভেঙে তার মধ্যে বিমিশ্র দ্বান্দ্বিক অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে লেখক একটি অতিলৌকিকতার পরিমণ্ডল নির্মাণ করে দিলেন। ইতিহাসের মজনু শাহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নায়ক ভয়ঙ্কর সূর্যস্নাত মাঠে একা দাঁড়িয়ে থাকেন। মৃত সাকিনা হাঁটতে শুরু করে। এবং জীবিত মানুষেরাও মৃত মানুষের সঙ্গে হাঁটতে আরম্ভ করে। কখনও কফিনের মধ্যে শরীর প্রচণ্ড রোদে বরফের সাথে মিশে জল হয়ে যায়। সীমান্তে মানুষ বদল হয়। কফিন বদল হয়। শূন্যতা নামে। লীন হয়ে যাওয়া ছাড়া মানুষের যেন কিছুই করবার নেই। ভাববাদী সত্যে পৌঁছে গিয়ে লেখককে উচ্চারণ করে যেতে হয় যে অনাথ সেন এবং লাবণ্যের সাথে তৃতীয় পক্ষ কেউ একজন পদযাত্রার সঙ্গী হয়ে আছেন। বাস্তব এবং পরাবাস্তবের গ্রন্থনে এখানে মুক্তি। পথনির্দেশনা। একটি গাধা এবং কলুধোপার বউয়ের মাথার উপর দিয়ে একবার একটি চাঁদ ম্যাজিক আয়নার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল। প্রাচীনতার তালপাতা নকশার ফুল ফুটিয়ে তুললে 'শূন্য অথবা নকশা ফুলের সুগন্ধ' ছড়িয়ে পড়েছিল চারধারে। অনিশ্চিত কালের জন্য লেখা হল রক্তের মধ্যে শূন্যতার বিস্তার ঘটে। স্থির হয়ে থাকার মধ্যে শূন্যতা

সর্বগ্রাসী রূপ প্রাপ্ত হতে পারে। রাজনীতির সংকীর্ণতা প্রত্যক্ষণের কেন্দ্রে এলে আকাশজোড়া অন্ধকারের রহস্য ছেয়ে যায়। মৃতনদীর দৃশ্যপটে উঠে আসে 'ভবনদীর ঘাট'। হ্যারি পটারের যাদু কিংবা মৃত মানুষের করোটি যাদুদণ্ডের ওপর স্থির রেখে লেখক ক্ষয়িষ্ণু ক্রোধ উপশমের ইঙ্গিত সুপ্ত করে দিলেন। অসঙ্গতির এই প্রকাশটি দহ তলদেশে গূঢ়তার আবরণে চাপা থেকে যায় অনেক ক্ষেত্রে। ছিন্নমস্তা এই সময়ের দহ আমাদের নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়ে দেয়। রাত্রির অন্ধকার গাঢ়তর হলে হতাশ এক ধরনের অনিশ্চয়তা বাস্তব হয়ে ওঠে। পেশাদারি আঘাতের নির্মমতা সহ্য করতে না পেরে চক চন্দনঘাটের বাঁধের উপর মুখ থুবড়ে শুয়ে ছিল একজন ছিনতাইকারীর অসহায় দেহ। পাশাপাশি ভোগ এক বোধহীন উপাদান উপলব্ধ হলে মৃতবৎসা নারী মণিমালা মূল্যহীন হয়ে পড়েন। তার পুরুষ্টু স্তনে নখের আঁচড় বহন করে মানচিত্রের নদীপথের মতো শাদা শাদা রেখার অস্তিত্ব। শিবনাথ যেন তার স্তনের নদীপথের রেখা ধরে একাকী দাঁড়টানা নাবিক। দুটি অনিবার্য পরিণতিই সময়ের বৃত্তে সমার্থক। রুক্ষ দিনের আবির্ভাব অন্তিম পর্বে সংকট নিষ্পন্ন ধ্বংসের নির্মমতাকে সূচিত করে রাখল।

প্রতিটি আখ্যানকে পীযূষ নিজস্ব শৈলীতে বিনির্মাণ করেন। জীবনের শূন্য অবস্থানের বৃহত্তর সংকট তাঁকে পীড়া দেয়। ব্যক্তি থেকে সমষ্টি, বাস্তব থেকে অবাস্তব, স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গ প্রভৃতি এক বিরাট পথপরিক্রমায় লেখকের অনন্তবোধটি ব্যক্ত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'প্যাশন' হিসেবে অলৌকিক আচার এবং প্রাকৃতিক ভূমির কথা উপস্থাপিত হয়েছে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত ধারণাটি তিনি ব্যক্ত করেছেন ভাষাশৈলীর অসামান্য দক্ষতায়। তাঁর রচনায় শব্দ ব্যবহার সমষ্টিগতভাবে একটি অর্থক্ষেত্র তৈরি করে দেয়। 'পর্বতশৃঙ্গে একাকী সূর্যের যখন দেখা মিলল তখনই বিজনের মনে হয়েছিল ওখানে একটা গাছ থাকলে ভীষণ ভালো হত। গাছই তো পৌরাণিক অক্ষবিন্দু। এই বিন্দুতে সময় চিরায়ত, কর্মচঞ্চল ও বিশ্রাম একীভূত। আর বিন্দুর চতুর্দিক ঘিরেই তো সব কর্মকাণ্ডের আবর্তন। তাদের টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখা, দেখতে দেখতে বিজনের মনে হয়েছিল সূর্য গড়িয়ে অচেনা খাদে পড়ে যাবে না তো! কিন্তু মণিকা থর মরুভূমিতে সূর্যাস্তের প্রসঙ্গ তুলেছিল, সেও নাকি ভীষণ সুন্দর রশ্মির বিচ্ছুরণে অপার্থিব সৌন্দর্যের অধিকারী হয়ে ওঠে মরু বালুকণা (মেয়েমানুষের গল্প)।' উদ্ধৃত অংশটি পাঠ করে পাঠক নিশ্চিত হয়ে যান যে এই অংশটি কোনও নৈসর্গিক সৌন্দর্য বা নারী সৌন্দর্যের বর্ণনা নয়। দীর্ঘ গঠনের বাক্যের অভ্যন্তরে এক অন্তর্লীন আবেগকে প্রোথিত করে দিয়ে লেখক একটি বিরোধাভাসকে ব্যক্ত করলেন। টাইগার হিলে সূর্যোদয় বিজন আর মণিকার জীবনে রোমান্টিকতার বিপরীতে স্থবিরতার ইঙ্গিত বয়ে আনতে যাচ্ছে তার সূচক হিসেবে গাছ এবং পৌরাণিক অক্ষবিন্দুটি উল্লেখিত হল। অথচ মানবীর সৌন্দর্যের প্রাতিস্বিকতা বোঝাতে মরু বালুকণার অপার্থিব সৌন্দর্যের উল্লেখ রয়ে গেল। নারী জীবনের সংকট আখ্যান মুখ্য হবার অবসর পেলে তিনটি স্ত্রীবোধক সত্তার সমন্বয় ঘটে যায়। অব্যক্ত ভাষার বুনটে একটি জালিকা তৈরি হয়। মণিকার সংকট সঞ্চারিত হয় চুমকির কাছে। গোলাপির প্রসব যন্ত্রণার মধ্যে সেই সংকটের বৃত্তটি গভীরতর হয়ে ওঠে।

নিজের অনুভূতিকে স্বতন্ত্র শৈলীতে প্রকাশ করেন পীযূষ ভট্টাচার্য। সাধারণ পাঠক বিব্রত বোধ করলেও লেখকের চিন্তনপ্রবাহটি মনস্তত্ত্বের নানা প্রবাহে জটিল বিভঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। কাহিনী নির্মাণ ক্ষেত্রে তিনি ঘটনার ধারাবাহিক উপস্থাপনায় আগ্রহী নন। কখনও হঠাৎ চমক দিয়ে আরম্ভে আগ্রহীও নন। ধীরলয়ের অমোঘ গতিতে আখ্যান উদ্দেশ্য সাধনে এগিয়ে যায়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরস্পরের হাত ধরে চলতে থাকে। ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রকরদের মতো আপাত অস্পষ্ট কিছু বর্ণনা কিংবা ঘটনা অন্তরালে যাদুবাস্তবতার প্রয়োগে সংকট ও সংকট নিষ্পন্ন পরিণতির আভাস পাঠককে জানিয়ে লেখক নীরব হয়ে থাকেন। সাযুজ্যময় গদ্যশৈলীতে বিধৃত হতে থাকে সময়ের দ্রুত পরিবর্তনের কথা। আখ্যান অন্তরালের উদ্দেশ্য ও রচনাশৈলী পরস্পর নির্ভরতার সূত্রে ঘনীভূত হয়ে যায়। স্পষ্ট ইঙ্গিতে সংকট ও সংকটমোচনের কাহিনী প্রবাহিত হতে থাকে।■

একটি ভিন্নধর্মী সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

বৈতানিক

সম্পাদক:গৌতম রায়
২৩, লালা রাজপত রায় রোড
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি

বাংলা ছোটগল্প : একটি প্রস্তাব

দিলীপ কুমার বসু ও অমিতাভ গুপ্ত

এই প্রস্তাবের বিপক্ষে-স্বপক্ষে, আপাতত, পীযূষ ভট্টাচার্যের একটি অথবা দুটি ছোটগল্প বা একটি অথবা দুটি গল্প সংকলন, রইল।

মনে রাখতে হবে বাংলা সাহিত্যের দরবারে প্রস্তাব পেশ করার মতো তেমন কোনও শক্তি বর্তমান নিবন্ধ প্রয়াসীর নেই। অনধিকারীর কুণ্ঠিত স্পর্ধাটি তবু শাস্ত্রশাসনতন্ত্র যথেষ্ট না মেনেই সটান নিবেদিত হতে চাইছে যেহেতু তার প্রিয় বা অতি প্রিয় ছোটগল্প লেখক, নিশ্চয় ঔপন্যাসিকও, পীযূষ ভট্টাচার্য দু'দিন আগে সদ্য রচিত গল্পটি শুনিয়ে গেলেন আর নিঃশব্দে জানিয়ে গেলেন প্রস্তাবটি পেশ করার সময় হয়ে এসেছে।

সমস্যা এইমাত্র যে, সৃজনকারীর পক্ষে সৃজনক্রিয়া সম্পর্কিত তত্ত্বমোক্ষণ করা সম্ভব নয়, তেমন অভিনিবেশের অবকাশও নেই। গাছের পাতার মতো পক্ষিশাবকের ডানার মতো সমিধের শিরায় আগুনকণার মতো সৃষ্টি স্ফুরিত হয়, লেখকের, কিন্তু সৃষ্টি রহস্যের মীমাংসাপ্রশ্ন শিরোধার্য করেন তদ্‌গত পাঠক যে, এই মুহূর্তে, পীযূষ ভট্টাচার্যের ছোটগল্প কৃতিকে মননে অনুভবে ধরতে চাইছে এবং তার মননকে অনুভবকে সামগ্রিক শুষে নিতে চেষ্টা করছে একটি। একটিমাত্র প্রস্তাব। প্রস্তাবের পূর্বাপরে নিশ্চয় ছড়িয়ে রয়েছে বিশ শতকের সত্তর দশক থেকে পুনর্জ্যোতিগম উত্তর আধুনিক চেতনা যাকে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেই মূলত সুচিহ্নিত করা হয়েছে। মনে রাখায় দোষ নেই, ইউরো কেন্দ্রিক পোস্ট মডার্নিজমের অভ্যুত্থানের বা ফ্রান্সীয় প্রবক্তা, নব্য সাংস্কৃতিক উপনিবেশতন্ত্রের পতাকায় যার নাম সগৌরব লেখা, লিওতারের আবির্ভাবের, পাঁচ বছর আগে অন্তত, বাংলা সাহিত্য চর্চায় উত্তর আধুনিক চেতনার প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে। মূলত ন্যায়দর্শন থেকে উৎসারিত এই প্রেক্ষিত তেমনভাবে ছোটগল্পের রসাস্বাদনে গৃহীত না হওয়ার একটি কারণ হয়ত বা পীযূষ ভট্টাচার্যের মতো লেখকের সংখ্যালঘু চরিত্র, আরেকটি কারণ নিশ্চয় এও যে পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশে জাতকে বা কথাসরিতসাগরে গল্প থাকলেও ছোটগল্প নামক বিশেষ বর্গটি নয়। উত্তর আধুনিক চেতনাসম্মত ক্ষেত্রকালাতীত অন্তর্বয়ানের কথা সবিশেষ করতে হয়, ছোটগল্প চর্চায়, প্রতিতুলনায় কবিতা চর্চা অধিকতর শিকড়মাত্রিক।

এখানে এখন কোনও ইঙ্গিত প্রয়াস নেই যে পীযূষ ভট্টাচার্যের ছোটগল্পের রসাস্বাদন

করতে গেলে পাঠককে অবশ্যই জয়েস-বোরহেস দিয়ে বোধবুদ্ধিকে প্রাকনিষিক্ত করতে হবে কেননা ইতিমধ্যে বাংলা ভাষায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কমলকুমার মজুমদার ছোটগল্প রচনা করেছেন আর অতিবিলম্বে হলেও জীবনানন্দ দাশ প্রণীত ছোটগল্পগুলি শেষপর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। ঘরের কাছে সাদাৎ হাসান মান্টোও রয়েছেন। অর্থাৎ পীযূষ ভট্টচার্যের ছোটগল্পকার হিসেবে আবির্ভাবকালে উক্ত বর্গটি সম্পর্কে বিজাতিতত্ত্ব সম্পূর্ণ লুপ্ত। পীযূষ ভট্টাচার্যের ছোটগল্পের প্রধান প্রস্থানভূমি চৈতন্য প্রবাহে জারিত নারীপুরুষ, তাই, বাঙালি পাঠকের সঙ্গে কোনও অনৈকট্য রচনা করে না বা মনে হতেও দেয় না যে গীতিশান্তনুসুতপাবিকাশ অন্যতর আকাশচারী।

অর্থাৎ, পীযূষ ভট্টাচার্যের ছোটগল্প শিল্পকে নির্ভর করে এবার বাংলা ছোটগল্পের মর্যাদা নির্ণয়ের প্রশ্নেও উত্তর আধুনিক চেতনাকে মান্য করার ভরসা থাকা উচিত। রূঢ়ভাবে নয়, একটু লাজুক একটু খাদে নামিয়ে আনা গলায় এবার বলে ওঠা যায় বাংলা ভাষার নতুন ছোটগল্পকে মডার্নিজম পোস্ট মডার্নিজমের কালোনিকষে যাচাই করার দরকার আর নেই। পীযূষ ভট্টাচার্যের চার পৃষ্ঠার একটি ছোটগল্প 'খুনী' সম্পর্কে হাজার পাঁচেক পাতার পোস্ট মডার্নিস্ট আলোচনা তৈরি হতে পারে বটে, কিন্তু সে আলোচনা সম্ভবত 'গোপিনী'র অনুষঙ্গে এসে মৃদু থমকে যাবে বা বড় জোর আবিষ্কার করবে পীযূষ ভট্টাচার্যের ছোটগল্পে ব্যবহৃত অবিচ্ছিন্ন-অবচ্ছিন্ন যৌনতাবোধের প্রতিমা পরম্পরা, যার একটি অপ্রকাশিত সদ্যশ্রুত, অপ্রকাশিত এখানও বলেই বিশদকথা এ প্রসঙ্গে নৈতিক নয়, সেই ছোটগল্পে বয়ঃসন্ধির দংশনটিকে এক অবিশ্বাস্য লোককথা প্রয়োগে বাস্তব-অবাস্তবের টালমাটালে আশ্লিষ্ট করে।

তবু, মূল প্রস্তাবের দিকে আরেকটু এগিয়েই যেতে হয়, পীযূষ ভট্টাচার্যের শিল্পসৌন্দর্য যেহেতু এক অধিকতর দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে ছোটগল্প শিল্পকে, তাই, স্পষ্টত নির্বিশেষ থেকে রূপে উত্তীর্ণ করে পাঠককে অন্য এক নন্দন পরিণামে। অর্থাৎ পীযূষ ভট্টাচার্যের যে কোনও ছোটগল্প সংকলন উত্তর আধুনিক চেতনার সেই পরমাশ্রয়, যা পাঠসংহতি বলে কথিত অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। পৃথক মত থাকতেই পারে। যেমন, 'পদযাত্রায় একজন' সম্পর্ক একটি নিপুণ বিশ্লেষণ করেছিলেন দিলীপকুমার বসু।

লেখক পীযূষ ভট্টাচার্যের একটি অ-সাধারণ অতি নিজস্ব ভাবজগৎ আছে, যা তাঁর সব গল্পেরই ভাষা ব্যবহারে ফুটে ওঠে। তাঁর আগের লেখা যে দু-একটি বই হাতে পেয়েছি, সেগুলিতেও এই বিশিষ্ট ভাবমণ্ডল ও ভাষা ব্যবহার চোখে পড়ে। যেভাবে এই লেখক তাঁর গল্পগুলিকে গড়ে তোলেন তাতে গল্পের বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন–ভারতে বাম রাজনীতির নতুন মোচড় বা প্রতিবেশী এক রাষ্ট্রের 'মুক্তিসংগ্রাম'-এর মাধ্যমে জন্মকথা, উপচীয়মান লোভে মানুষের পাশবিক হবার প্রক্রিয়াটি বা সকল কদর্য বাস্তবকে অগ্রাহ্য করে ভালবাসার দৈনিক রূপকথা–এইসব ভিন্ন বিষয়বস্তুর চেয়েও বোধহয় বড় করে পাঠকের সামনে অনবরতই এসে পড়ে লেখকের এক মনোজগৎ ও ভাষা ব্যবহার, যা অবিরত স্রোতের মতো তাঁর চেতনার সঙ্গে বহির্বাস্তবের সম্পর্কটি দেখাতে দেখাতে চলেছে। এই জগতের

পরিচয় এক রকমভাবে নির্দিষ্টও করা যায় কতকগুলি চিহ্ন তা বারবার গায়ে এঁকে নিচ্ছে বলে। চিহ্ন বা সংকেত, উল্কি বলা যেতে পারে, যে 'উল্কি' নিয়ে এই বইয়েই একটি গল্প আছে–'মধুবনী'–যাতে একটি চরিত্র বলে উঠছে, 'উল্কি হচ্ছে সিভিলাইজেশনের প্রাচীনতম ইঙ্গিতবাহী অঙ্কনপদ্ধতি।' এই বিশেষ গল্পটিই যখন লেখক এ বই থেকে বেছে নিয়েছেন তাঁর নির্বাচিত গল্প নামক সংকলনে, অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে তাঁর নিজের ভুবনে প্রবেশের কোনও চাবিকাঠি এই গল্পে আছে।

গল্পটি সবিস্তারে খুলে ধরা যাবে না। ছোটগল্পের আলোচকের কাছে সেই অসুবিধা অনেকটাই আছে যে অসুবিধা রহস্য গল্প-উপন্যাসের আলোচকের থাকে–কাহিনী শেষের জায়গাটা আলোচনা করলে গল্পের লেখক ও পাঠকের প্রতি অবিচার হয়। যদিও বর্তমানে আলোচ্য গল্প লেখকের রচনাশৈলী এমন ধরনের নয় যাতে শেষ পংক্তি বা অনুচ্ছেদটি পাঠক গল্পটি প্রথমবার পড়বার আগেই প্রকাশ করে দিলে গল্প পাঠে খুব বড় একটি ক্ষতি হবে, তবু কিছুটা ক্ষতি তো হয়ই।

এতৎসত্ত্বে গল্পের 'থিম'-এর দিকটা একটু বলতে হবে, ঘটনা বলতে গিয়ে। একটি লোক জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিল এমনিভাবে যেন রাস্তার উল্টোদিকের বাড়ির এক দম্পতির ঘনিষ্ঠ জীবন দেখছে। ঐ দম্পতির পুরুষটি গিয়ে লোকটির মুখে ঘুষি মারে, ফলে তার নাক দিয়ে রক্ত গড়ায়। সেই আশ্চর্য লোকটি কিন্তু ভ্রূক্ষেপ না করে পুরুষটির হাতের উল্কি দেখতে থাকে, উল্কি সম্বন্ধে নানা গূঢ় সংবাদ জানাতে থাকে। 'প্রাচীনতম ইঙ্গিতবাহী অঙ্কন পদ্ধতি'-র কথাটা ঐ সূত্রেই বলা।

দম্পতির যে মানুষটি স্ত্রীলোক তার প্রাণকে আকর্ষণ করতে থাকে ঐ আশ্চর্য লোকটির পরিমণ্ডলের রহস্য।

আমার মনে হয়েছে পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের একটি চাবিকাঠি এখানে রয়েছে। যেখানে ঘুষি, রক্তপাত, দাম্পত্য জীবন–সেখানে থাকে আমরা যাকে বলি 'ঘটনা', তার আকর্ষণের চেয়ে বড় আকর্ষণ উল্কির রহস্য, সভ্যতার এক স্তরের এক প্রতিনিধি উল্কি-আঁকিয়ের মনোজগতের রহস্য।

২

এর পরে হয়ত, আলোচকের যা কাজ, বিশ্লেষণ করে একটু দেখাতে হবে উল্কি আঁকাআঁকিটা কেমন–কতকগুলি চিহ্ন বারবার আঁকা দেখা যাবে গল্পগুলিতে। প্রথম চিহ্ন একটা দ্বিখণ্ডনের : মানুষ, এবং অন্যান্য নানা জিনিস, দ্বিধাবিভক্ত, অনেক সময়ে পরস্পরের প্রতিস্পর্ধী আবার একই রকমও–'দ্বৌষজৌ সুপর্ণা'-র অনুষঙ্গও কখন আবছাভাবে লক্ষ্যণীয়। রক্ত গড়িয়ে পড়ার চিত্রকল্প নানা পরিবেশে নানা কারণে বার বার এসে পড়েছে। অনেক, কখনও অথই জল, আর তার উপরে একটু স্থলভাগ ভেসে উঠছে–এভাবেই মানব অস্তিত্বকে বারবার দেখা হয়েছে। অস্তিত্বের স্বরূপ চেনাচিনির পথে জল খুব এক প্রধান গভীরতার কথা জানায়, আর সেখানে যে আর্কেটাইপ বারবার গল্পগুলিতে অন্তর্বয়ন সম্পন্ন

করে তাতে থাকে দশাবতারের দু'জন যারা জলের সঙ্গে যুক্ত : মীন ও কূর্ম অবতার। মীন গতি দিয়ে জীবনের নৌকা টানে, মাছের কঙ্কালের মতো দেখতে এক বিরাট নৌকার ছবি আছে এক জায়গায় যা একটা বিখ্যাত পেইন্টিংকেও কোনও পাঠককে মনে করাতে পারে–আর কচ্ছপের খোলের উপর ভেসে ওঠে কখনও একখণ্ড জীবন, কিছুক্ষণের স্থায়িত্ব।

'অভিশপ্ত দেবদূত' নামে এ-বইয়ে একটি গল্প আছে যাতে লোকপুরাণের সেই গল্প রয়েছে যাতে আত্রাই নদীর রূপে মুগ্ধ দৈত্য তাকে ভুলিয়ে নিয়ে পালাচ্ছিল, দেবদূতরা জানতে পেরে বাঁচাতে যায় তাকে, দৈত্যকে হত্যা করে, কিন্তু এক মুহূর্তেই হয়ে যায় অভিশপ্ত কারণ নদীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তারাও প্রেম নিবেদন করেছিল। এরপর থেকে তারা ফুলগাছ হয়ে নদীকে বন্দনা করেই চলেছে নদীতীরে। এই ছবিও চকিতভাবে কখনও বা কিছু সবিস্তারে একাধিক গল্পে আছে। (ফুলগাছ ও নদীর এই ছবির একটি প্রাক্‌রূপ বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'-তে আছে কোথাও, বাংলা সাহিত্যে অন্যত্রও যেন তার এক-আধটি রূপান্তরের নজির আছে; পীযূষ ভট্টাচার্যের উপস্থাপনায় এই ছবি তাঁর ঘনসংবদ্ধ সংকেতপূর্ণ নিবিড় জগতের অংশ হয়েছে যেমন, তেমনই আবার বাংলার প্রাচীন কিছু সাংস্কৃতিক রেখাঙ্কন অঙ্গে ধারণ করে গভীরভাবে বাংলা ভাষা হয়ে উঠেছে।)

মৃতবীজ-এর কথা একাধিক গল্পে আছে।

এইসব নানা চিহ্ন দেখা যায়। এর মধ্যে সব চেয়ে স্পষ্ট বৃহৎ চিহ্ন, যার কথা প্রথমেই বলা হয়েছে এবং যা বাক্যের ভাষা পেরিয়ে কাহিনী রচনার ভাষায় চরিত্র উদ্ভাবন ও অন্যান্য নানা উপায়ে আঁকা হয়েছে, সেই 'দ্বিধাবিভক্তি' ভিন্ন ভিন্ন গল্পে নানা ভিন্ন চেহারা নিয়েছে : মৃত ধনেশপাখি ও জীবিত ধনেশপাখি, লেংড়ি মালতী ও ধলি মালতী, ঐতিহাসিক সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সেই নামের একটি সাধারণ মানুষ, এইসব দৃষ্টান্ত পাঠকের সহজেই চোখে পড়ে।

৩

গল্পগুলি সম্পর্কে আর অল্প দু-একটি খবর, দু-একটি কথা : প্রথম কথাটি সব চেয়ে বাইরের খবর–এই বইয়ের বারোটি গল্পের নয়টি ২০০২-০৩ সালে লেখা, তিনটি ২০০০ সালে। এছাড়া দেখা যেতে পারে, 'বাম রাজনীতি'-র প্রকৃতি পরিবর্তনের গল্পের, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের গা ঘেঁষা সময়ের মানুষদের গল্পের সঙ্গে, সাম্প্রদায়িকতার প্রকোপে জাত বিষণ্ণতাকে তুলে ধরার সঙ্গে মিলেমিশে আছে একাকিত্বের, অনিবাশী প্রেমের, আবার কাটছাঁট হওয়া খাটো মাপের প্রেমের, জীবনের গল্প। বিভিন্ন স্থানের মানবীয় কাজকর্ম ও ব্যস্ততা জুড়ে যাচ্ছে একই গল্পে, গল্পের শেষ কথাটা বলতে। 'পদযাত্রায় একজন' গল্পে একটা ভিড় হয়েছে কোনও ফেরিওয়ালার নানা যাদুকরী ওষুধের গুণসম্পন্ন গাছপালা বা ধনেশপাখির শরীরের অংশাদি কেনাবেচা যেখানে হচ্ছে সেই ফুটপাথে, পাশে আদালতে চলছে হত্যা বা বিবাহবিচ্ছেদের মামলা হাকিম-উকিল-পেয়াদার তৎপরতায়; নিষ্ফলা পুরুষ সর্বত্র : যারা ব্যাকুল, অবস্থার সংশোধনে অভিলাষী, বা নিহত বা শ্রান্ত পরাজয়ে অপসৃয়মাণ।

স্ত্রীলোকেরা লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে উদ্বিগ্ন কারণ কোনও সন্তানের জন্ম হয়ত দিতে পারবে না কোনও ভাবেই। এই হল বিপুলসংখ্যক মানুষের বর্তমান পদযাত্রার ছবি। অন্যান্য গল্পেও আত্মহত্যা, মৃত্যু, গর্ভ নষ্ট হওয়ার ছবি আসে বারংবার। নদীর মতো মেয়েরা, যাদের 'সমুদ্রের হৃৎপিণ্ডে আছড়ে পড়বার কথা', 'থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল?' তাদের কেউ নামহীন, কারও নাম আছে, সে নাম হয়ত নীনা, হয়ত ইতু বা আর কিছু–কিন্তু পরিণতি কোনও না কোনও ভাবে একই।

পুরুষ আর স্ত্রীলোক এই গল্পগুলিতে কোনও সফল মিলনে জীবনের সপ্তপদী সম্পূর্ণ করে না, যদিও 'গত বছরের রূপকথা'-র মতো গল্পে প্রেমের পরাজয় ঘটে না। গল্পের সৌন্দর্য যখন আমরা খুঁজব আস্বাদনে, সেখানেও পাওয়া যাবে বাংলা রূপকথার বয়নে সামান্য মধুমালা-মদনকুমারের প্রেমকাহিনীতে অসামান্য বহুস্তরীয় আভা (গল্পের শেষটি ভারি চমৎকার, যেখানে নবীন এক আঙ্গিককে স্মিত আশীর্বাদ করেন বাংলার মহাকবি)।– এরকম গল্পেও অবশ্য রক্ত গড়াতেই থাকে, নতুন জীবনের সম্ভাবনাময় ঋতুস্রাবের রক্তের প্রত্যুত্তর হয়ে আসে হীনবীর্য পুরুষ, তার রক্তপাত; আর, সার্বিক মৃত্যু। এইসব রক্তপাতকে লিপিবদ্ধ করার পর রক্তপাতকে অস্বীকার করে লেখক তাঁর সংকেতময় জীবনভাষ্য রচনা করতে থাকেন সৃষ্টি ও সভ্যতার হয়ে, কারণ তাঁর চোখে ধরা পড়েছে মাদুলি দিয়ে সর্ব রোগ হরণ করবে বলে যে দাবি করে তার সঙ্গে রাজনীতিবিদের চৌর্য-চাতুর্যের মিল, মানুষ তার হিসেবিয়ানা নিয়ে লেখকের কাছে পশু হয়ে যায়, 'নিয়ন্ত্রিত ভালবাসা'-য় নির্ধারিত অধিকাংশ জীবনের কোনও সার্থকতাই ফুটে ওঠে না, দেবদূত ও দৈত্য দুই-ই রাখায় একাকার হয়ে যায়, কুয়াশায় ও জ্যোৎস্নার জীবনের সব ভবিষ্যৎ অত্যন্ত রহস্যময় ও অস্পষ্ট দেখায়। নতুন রাষ্ট্রের জন্মকাহিনীতে কোনও হর্ষের কথা থাকে না, থাকে খুন আর রক্তপাতের চিহ্ন। একটু আশা তবু জাগিয়ে রাখার চেষ্টা থাকে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে, একাকী একটি সামান্য রিক্‌শাচালকের বয়ানে লেখকের এই আশায় যে তার স্বপ্নের ঘোরের মতো এই জীবন দেখায় হয়ত খেয়াল হয়নি, শোনা হয়নি সেই স্বর যার অধিকারী 'নিশ্চয় লেংড়িকে দেখে প্রথম চিৎকার করেছে', মানবিকতার দায়িত্ব ভোলেনি এমন মানুষের অস্তিত্ব আজও নিশ্চয় আছে। 'তবে কি এখন আর কেউ মৃতকে দেখে না!' সচল ধলি মালতীর আসঙ্গ কামনায় ভুলে থাকে, উপভোগের দিবাস্বপ্নে হারিয়ে যায় লেংড়ি মালতীর অস্তিত্ব ও স্মৃতি?

এ ধরনের আলোচনার নিপুণতা অনস্বীকার্য তাই সপ্রদ্ধ, তবু, মনে হয় এবার, ধরা যাক পীযূষ ভট্টাচার্যের অন্যতম প্রধান সংকলন 'কীর্তিমুখ' আলোচনা করতে গিয়ে, হয়ত 'পদযাত্রায় একজন'ও। পাঠসংহতির কথা না এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। দিলীপকুমার বসুর তুলনারহিত মেধার সঙ্গে এই নিবন্ধপ্রয়াসের মূল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিশ্রণ ঘটল। যেহেতু বিপরীত সংস্থাপনে যা মতাদর্শগত বৈপরীত্য নয় মোটেই বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হতে পারে। 'কীর্তিমুখ'-কে যদি ১২ টি এককের সমন্বয় বলে ধরা হয়, নিতান্ত ছোটগল্প সংকলন না বলে। 'পদযাত্রায় একজন' পাঠকৃতিটিও কি তেমনই সংহত নয়? নির্বাচিত গল্প অবশ্য একটি স্বতন্ত্র জেদের

বই, মনে হয়েছে যেন বিভিন্ন পাঠসংহতি থেকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে আনা কিছু আখ্যান, যার মধ্যে ধারাবাহিকতাময় মৎস্যপ্রতীমটি নেই যা জৈব-অজৈব প্রতীকের দোলাচলে 'বাড়তি জলের স্রোতে বেরিয়ে যাওয়া মৃত মাছ' আর 'রান্নার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসা মাছের শব আর 'বিষ দিয়ে মেরে ফেলা পুকুরের সমস্ত মাছ' আর অ্যাকোয়েরিয়ামের মাছের সঙ্গে কচ্ছপ-চিতাবাঘ-টিকটিকি একাকার হয়ে যেতে থাকে। মনে হয় না পীযূষ ভট্টাচার্যের পাঠসংহতি কোনও অসচেতনায় গাঁথা।

প্রকৃত প্রস্তাবে, যদি কখনও যোগ্যতর কেউ অর্থাৎ বর্তমান প্রস্তাবকের চেয়ে যোগ্যতর বীক্ষণে পীযূষ ভট্টাচার্যের উত্তর আধুনিক শিল্পী সত্তাটিকে মুক্ত করে দিতে পারেন, তাহলে বাংলা ছোটগল্প সামগ্রিক ছোটগল্প শিল্পটিকে যে কৃতিদান করবে সেখানে পীযূষ ভট্টাচার্যের তীব্র মধুর সন্ন্যাসটি যেন মডার্নিস্ট পোস্ট মডার্নিস্ট জাড্যকে মথিত করে যায়, মথিত করে যেতে পারে।■

যে পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যাই ভিন্ন

নীললোহিত

সম্পাদক : বাসব দাশগুপ্ত

আগামী সংখ্যার বিষয় : মৃত্যু

১৫, কাজি নজরুল ইসলাম সরণি, নিমতা, কলকাতা ৭০০০৪৯

স্বপ্নের অন্ধকার ও একটি যাদুর তালপাখা

রাজীব চৌধুরী

'এ জন্মেই তো বারবার করে জন্ম নিতে হচ্ছে। এ জন্ম নেওয়ার মধ্যে আছে যতটা তেজ তার চেয়ে বেশি কষ্ট। তার জন্যই শব্দের সীমানা ছাড়িয়ে শব্দ শোনানোর দায় থেকে গেছে জীবনে।'

তৃতীয় বিশ্বে মানুষের এই বারবার একই জীবনে নতুন করে জন্ম নেওয়ার তাৎপর্য 'রেজারেকশন' নয় বরং 'মেটামরফোসিস'-এর অভিধায় অনেক বেশি ইঙ্গিতবাহী হয়ে ওঠে। বেঁচে থাকাটাই মৃত্যু, নাকি মৃত্যুটাই হয়ে ওঠে সব যন্ত্রণার উপশম–অস্তিত্বের পেন্ডুলাম 'এরস' আর 'থ্যানাটস'-এর দুই প্রান্তে দুলেই চলেছে পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পগুলিতে, কোনও 'সমাধানসূত্র' খুঁজে পাবার চেষ্টায়। জীবনের ত্রিমাত্রিক বিন্যাসকে কি পাটিগণিত, জ্যামিতি বা ত্রিকোণমিতির ছকে ধরা যায়? গল্পে কিন্তু জীবনখণ্ড আর এক-একটা অঙ্কের একান্তর বিন্যাস ঘটিয়ে পীযূষ তৈরি করেন এক আশ্চর্য উত্তরপত্র। বোঝা যায় মানবজীবন কিংবা প্রকৃতিরই নানা বিন্যাসের আশ্রয়ে যেমন ভিত্তি তৈরি হয় বিজ্ঞানের; তেমনই নিছক পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত অঙ্কের নির্জীব প্রশ্নমালাও আবার কখনও চেতনা প্রবাহে অস্তিত্বের শিকড়ে গিয়ে কোথাও টান মারে! এই ধরনের লেখাগুলির বৈশিষ্ট্য আমরা ডেভিড লজ-এর কয়েকটি মন্তব্য থেকে ধরার চেষ্টা করতে পারি যেখানে তিনি লিখছেন। '... reality was increasingly located in the private, subjective consciousness of individual selves... . It has been said that the stream of consciousness is the literary expression of Solipsism, the philosophical doctrine that nothing is certainly real except one's own existence; ...'(The Art of Fiction, 1992, p.42)

'পদযাত্রায় একজন' বইটির 'সমাধানসূত্র' গল্পটিতে দেখি বিচ্ছিন্ন স্মৃতি টুকরো গুলির মধ্যে দিয়ে একটা নকশা তৈরি হচ্ছে এবং যেগুলিকে জুড়ে জুড়ে দিচ্ছে অন্ধকার। 'পরম যত্নে সত্যকে লালিত করবার আঁধার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, যাবেই...', 'অন্ধকারে ক্ষত বুঝি খুবই নিরাপদ!'; 'অলকার উলঙ্গ শরীর হাত পঁচিশেক দূরে আবছা জ্যোৎস্নায় বর্ণময় ফুলের ঝর্ণার তলদেশের তরল অন্ধকারে গুলিয়ে যাচ্ছে'–এইসব অন্ধকার কখনও বর্ণনায়, কখনও

অস্তিত্বের অন্দরমহল নির্দেশী উপমায় আমাদের পৌঁছে দেয় গল্পের বাইরের খোলসটি থেকে, ভেতরের কোনও কাহিনীতে। এক ধর্ষিতা মহিলা অলকার বর্তমান তার ছেলে আলোকের জিজ্ঞাসা করা কতগুলো অঙ্কের প্রশ্নে তাকে বারেবারে পৌঁছে দেয় বিবাহোত্তর জীবনের দুর্ঘটনার সেই রাতটিতে। গল্পটির নির্মাণে 'বর্তমান কাল'-এর ধারণাটি শুধুই কয়েকটা অঙ্কের প্রশ্ন এবং তারই জটিলতর সমাধানসূত্র খুঁজতে যাবার চেষ্টা আসলে ভুলতে চাওয়া অস্বস্তিকর অতীতকেই বারে বারে স্পষ্ট করে তোলে। সুতরাং nothing is certainly real except one's own existence ...। চরিত্রগুলির ভেতরকার পরিস্থিতি আর যুদ্ধেরই নিয়ত কথামালা পীযূষ ভট্টাচার্যের ছোটগল্প। তাই সংলাপের মুখরতা তার গল্পের একটা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অস্তিত্বের গভীর যাপনচিত্র যখন সামূহিক মানব অস্তিত্বের ভিতর মহলে ডুব দেয় সিজলি তখন সিজলিবাঈ হয়ে তার রক্ষাকারী দাঁড়াশ সাপটির মৃত্যুতে যা যা করে একমাত্র স্ত্রীরাই তা করে থাকে মৃত স্বামীর জন্যে। 'সিজলি মার্ডির পৃথিবীতে চিতাবাঘ' গল্পের মধ্যে সামূহিক অবচেতনার পথ ধরে ধানখেতের বুকে ধর্ষিতা সিজলি হেমন্তকালে সৃষ্টির আদিগল্পের ধরিত্রী হয়ে ওঠে যেন। ঠাকুর জীউর আদেশে কচ্ছপের পিঠে যে পৃথিবী তৈরি হয় তা কেঁচোরা মাটি জমিয়ে জমিয়ে করেছিল। ধর্ষিতা সিজলিও ফলে ভাবে যে, সে মাটি এবং ধানখেতের কেঁচোরা তার অনাবৃত শরীরের ওপর গড়ে তুলবে মাটির স্তূপ এবং সেখানে নতুন জনপদ সৃষ্টি হবে–তখন লোকায়ত সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী, উর্বরতা কেন্দ্রিক গোষ্ঠী বিশ্বাস আর ব্যক্তির আত্মগত সংকট একবিন্দুতে এসে দাঁড়ায়। এ যেন এক অন্য সভ্যতার কাহিনী! সেখানে অবশ্য ইন্দো-সুজুকির আরোহী ধর্ষকটিও রয়েছে–সিজলির দৃষ্টিতে সে চিতাবাঘের আরোহী কিন্তু সেই ধর্ষণ তার মনে কি আদৌ রেখাপাত করে? এমনকী কথকও তো সেই দৃশ্যকে আড়াল করে দেন অন্ধকার দিয়ে; বলেন, 'সিজলির গ্রানাইট স্তন, শালখণ্ডের মতো শরীর মাটিতে আছড়ে পড়ে প্রত্নতত্ত্বের বিষয় হয়ে যাচ্ছিল যখন মোটরবাইকের আলো রাস্তার মোড় ঘুরতে বৃত্তাকারে ধানক্ষেতের উপর দিয়ে ঘুরে চলে যায়। আবার অন্ধকার, যদিও এ গল্পে অন্ধকারের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। কেননা সিজলির নিম্নাঙ্গ চুঁইয়ে রক্তের ধারা বইছে। গল্পের প্রয়োজনে অন্ধকারের আশ্রয় নিতে হচ্ছে বলে মাপ করবেন। মানুষের সভ্যতার দাবি বোধ হয় এরকমই।' সভ্য পাঠক আর অ-সভ্য সিজলির আখ্যানের মাঝে এমনই এক কথক আর তার কথন বিরাজ করে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। তদন্ত করতে গিয়ে সমর যখন তার সঙ্গে দেখা করতে চায়–গায়ের কম্বল খুলে তার সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় সিজলি। আকস্মিকতায় সমর চোখ বুজে ফেলে কিন্তু তার মনে হয়, 'এ নারীর জন্য চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রর আলোই মানানসই, বজ্র-বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিই জলধারার উৎস, চুপি চুপি ঝরে পড়া হিমই সোহাগ।' এই সিজলি তো ফসলই, মাটির পৃথিবীই বটে–যাকে পাহারা দেয় লোককথার নয়–বাস্তবের এক দাঁড়াশ সাপ!

পীযূষ ভট্টাচার্যের কাহিনীর বয়নে অনতিস্পষ্ট বর্তমানকে ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে তোলে অতীতের খণ্ডগুলি। অনেক সময়ই এই অতীত স্পষ্টভাবে কিছু জানায় না–ইঙ্গিত দেয় কেবল। আর এই অতীত বুননই কখনও চরিত্রের জীবন ও অভিজ্ঞতার স্তর ছাড়িয়ে ঐ

জাতীয় সামূহিক ধারণামূলক আদিকল্পগুলিতে নিয়ে পৌঁছায়। 'খুনী' গল্পে খনার বচন সূত্রে টিকটিকির প্রসঙ্গ, 'গারসি সংক্রান্তির কাক' গল্পে আশ্বিনের শেষ দিনটিতে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ ঘি-ভাত খেয়ে যায় ত্রিকালদর্শী যে কাক তারই জন্যে অপেক্ষায় বসে সুধীনের স্মৃতিখণ্ডে সত্তা মিশে যাবার প্রসঙ্গ, 'দহ' গল্পটিতে ছিন্নমস্তার পুরাণ কাহিনীর আকল্প–এ রকমই অসংখ্য অব্যর্থ সমীকরণে তৈরি পীযূষের ছোটগল্পগুলি। নদীর খাতে বয়ে যাওয়া, নতুন করে গড়ে ওঠা জনপদের শতাব্দী প্রাচীন ইতিহাসে একই বিভঙ্গে পালাবদল ঘটবে। একটি চরিত্র সেই সময়ের পালাবদলের প্রেক্ষায় দাঁড়িয়ে ভাবে– "আগামীতে নদী হয়তো অনেক দূরে সরে যাবে, মুছে যাবে এ দেহের অস্তিত্ব। যদি কয়েক'শ বছর পর বোজা দহের তলদেশ থেকে উঠে আসে ছিন্নমস্তার লকেট, তখনকার সভ্যতা কী অবাক বিস্ময়ে দেখবে না, এক নিরাবরণ দেবী নিজের মস্তক ছিন্ন করে নিজের রক্ত পান করছে।" মাতৃ আদিকল্পের সৃজনী রূপটি যদি সিজলি মার্ডির গল্পে আভাসিত হয়ে থাকে, তবে তার মধ্যে সংহারের ভয়াবহ যে রূপটিও রয়েছে–সেটা ফুটে ওঠে 'দহ' গল্পটিতে। মানুষের একাকীত্ব, ঈর্ষা, নাশকতা, ঘাতকবৃত্তি–এ সবই একটি পটে আঁকতে আঁকতে গল্পকার আখ্যান শিল্পের অন্য স্তরটিতে এমন রসদ রেখে যান যা সহায়ক বা সম্পূরক বটে; কিন্তু আবহমানের শিকড়-বিযুক্ত পাঠকের পাঠাভ্যাসের স্বস্তিকে ধরে তা রীতিমত নাড়া দেয়। 'খুনী'-র মতো গল্পে নৃশংসতার প্রতিমাগুলির অন্দরমহলে গভীর অসহায়তা ভরা ট্র্যাজিডির সুরই তো বাজে! আর এই মাত্র চার পৃষ্ঠার জমাট গল্পটিতে লেখকের লিখন কৌশলের মুন্সিয়ানা আমাদের বিস্মিত করে। তিন পুরুষের মধ্যে ঠাকুর্দার ছবিটা দেওয়ালে, বাবা খুন করেছিলেন মাকে এবং জেলে, ছেলে ঠাকুরমা অর্থাৎ কত্তামার দেখভাল তদারকি করে। মায়ের মৃত্যুর প্রকৃত ইতিহাস অধরা; কিন্তু আশ্চর্য কৌশলে নির্ঘুম রাতে রক্তচাপের রোগীর বিড়বিড়ানি থেকে ছেলেটির কাছে সেই রহস্য ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে যায়–'আমি জেগেও উঠিনি এ কারণে যে, কত্তামার যে সব কথা খুবই গোপনীয় তা বলে ফেলেন ঘুমের মধ্যে।' গল্পটি উত্তম পুরুষ কথকের বাচনে আশ্রিত কিন্তু কত্তামার এই ঘোরের মধ্যে বলা সংলাপগুলিই তৃতীয় প্রজন্মের কাছে তার মায়ের মৃত্যু রহস্যকে উন্মোচিত করেছে। ছেলেটির স্মৃতিতে যা ছিল তা সামান্যই –'কুড়ুল হাতে বাবাকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলাম, টলতে টলতে, সারা রাস্তায় রক্তের ফোঁটা ছিটাতে ছিটাতে।' আর বয়ঃসন্ধিলগ্নে লুকিয়ে গোপিনীদের বস্ত্রহরণের যে ছবি সে দেখত তাতে মানুষের জন্মস্থানটি ঢাকা থাকলেও 'যখন মাকে শেষ দেখি সেটা উলঙ্গ অবস্থায় ছিল।' মায়ের মুখ আর তার মনে পড়ে না; কারণ বাবার কুড়ুলের আঘাতে তা থেঁতলানো ছিল। ঘাতক তার বাবাই; কিন্তু শৈশব স্মৃতিতে যেটুকু ছিল তাতে রেশ রয়ে গিয়েছিল শুধু দুটি প্রশ্নের–চিৎকার করে বাবা কত্তামার কাছে জানতে চেয়েছিল– দরজায় শিকল কে তুলেছিল? কে বেরিয়ে গেল ছিটকে? কত্তামার স্বগত প্রলাপ থেকেই ছেলেটি এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছে। সাত পুরুষের ভিটেটা জিতেনের কাছে বন্ধক ছিল; পুত্রবধূকে কত্তামাই জোর করেছিল–'আরে তোর ভাতার তোরই থাকবে একটা রাত্তিরে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।' কিন্তু সে রাতে অপ্রত্যাশিতভাবেই ছেলে ফিরে আসে! আরও একবার সেই ছেলে ফিরে আসছে! সবাই নিশ্চিন্ত ছিল, যাবজ্জীবনের আসামী মানে আমরণ

জেলেই থাকতে হবে। কিন্তু জেল থেকে মুক্ত হয়ে সে আসছে শুনে জিতেন সপরিবারে গ্রাম ত্যাগ করছে। গল্পকথকের মনে হয়, 'এখন আর সন্দেহ নেই বাবা শেষ পর্যন্ত পূর্বাপর জেনে গিয়েছিল ঘটনা।' তাই সে দেখে কত্তামার নির্ঘুম ত্রাস–আর টিকটিকির অনবরত ডাক। খনার জিভের বচনের মতোই অমোঘ। কেবল ঠিক-ঠিক-ঠিক। ঠিক আর ভুলের হিসেব ওলটপালট হয়ে গিয়ে এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি নিয়তির মতো বাজতেই থাকে গল্পটিতে– যতক্ষণ না গুনে গুনে আঠারোটা টিকটিকিকেই মেরে কত্তামার ঘুমকে নিশ্ছিদ্র করতে চায় তার নাতি। কিন্তু অলক্ষ্যে যার আগমনের ছায়া ভয়ের মতোই আসন্ন–সেই খুনীকে থামাবে কে?

স্বপ্ন, ঘোর আর এমনই সব আত্মমগ্ন চিন্তাখণ্ড পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পের শিল্পরূপের বিশেষ উপাদান। আর এই খণ্ডগুলির পটক্ষেত্রে বিচরণ করছে অন্ধকার। শিল্পী লেখকের কলম অন্ধকারের সৃজন আর বুননে পারদর্শীই কেবল নয়–অন্ধকারের প্রতি যেন লেখকের এক দুর্নিবার আকর্ষণ রয়েছে। এই সব অন্ধকারেই খুলে যায় অবচেতন আর মগ্নচৈতন্যের পর্দা। কালোর ওপর কালো রঙ দিয়ে শিল্পসৃজনের প্রাখর্য যেন মনে করাতে চায় অমনোযোগী পাঠক পীযূষের গল্প চায় না; মেধাবী পাঠকের সঙ্গে, মনোযোগী পাঠকের সঙ্গে তিনি দাবা খেলতে বসেছেন। আমরা নানা ধরনের কিছু অন্ধকারকে তুলে ধরে লেখকের এই কারুবাসনাটিকে দেখাতে চাই।

> 'এমনই অন্ধকার যে সূর্যের মুখ কোনোদিন দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না। মোমবাতি জ্বলে উঠতেই সুহাস ও দেবরঞ্জনের ছায়া মিলেজুলে দেয়ালে এক ষাঁড়ের আদল পেয়ে যায়। তা যেন কোনো একদিন অন্ধকার গুহার ভিতর আঁকা হয়েছিল। তার স্রষ্টাই বা কে? পুরুষ না নারী? চকমকির মিটমিটে আলোতে আঁকতে বসে কোন বার্তা পৌঁছে দিত দেবতার কাছে পশুর মাধ্যমে?'
>
> (স্বপ্নের বাস্তবতা)

> 'ফুটপাথ থেকে লাফ দিয়ে অন্তু যেই রাস্তায় পড়ে, তার নিজস্ব শরীরের অন্ধকার থেকে কেউ যেন তার পিতৃপুরুষের কণ্ঠস্বরে বলে ওঠে, 'সাবধান, অন্তু সাবধান।'...অন্তুর লম্বা দেহ ভাঙছে। অন্ধকারের পর অন্ধকার দেওয়াল চিত্রার্পিত ভাবে উঠে আসছে, মুখ থুবড়ে পড়বার আগ মুহূর্তে অন্তুর চোখে ভেসে ওঠে ছায়া ছায়া রাস্তার চতুর্দিকের মানুষের ছুটে আসা...'
>
> (আত্মরক্ষা)

'তার অতীত জীবনের জন্মপূর্বের অন্ধকার লাফ মেরে নেমে এসে

পূর্বস্মৃতি খুলে দেয়।... যদিও যে সব প্রসঙ্গ তার জীবনের অনুষঙ্গ, সেই সব কথার অনুরণন উর্ধ্বসীমায় পৌঁছে তার ব্যক্তির সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে বাইরের ঘন অন্ধকারে একটু একটু করে মিশে যাচ্ছে।'

(মাছ)

"মহানিশার অন্ধকার থেকে ছুটে এসে এক বিষধর সাপ ছোবলে ছোবলে জর্জরিত করে দিচ্ছিল যেন, নিস্তব্ধ আর্তস্বর–'আমি কি বাবুলকে বাঁচাতে পারতাম' ঘূর্ণির মতন পাক খেয়ে উঠছে। জানলায় আর চাঁদ নেই, চাঁদ কী দণ্ডকলসের ঝোপের ভিতর গড়াগড়ি খাচ্ছে!"

(দণ্ডকলসের ফুল)

অন্ধকারের চিত্রকল্প যেমন বর্ণনাগুলিতে রয়েছে, তেমনই চরিত্রের অতলস্পর্শী সেই অন্ধকার ভিতর আর বাইরের পরিবেশকে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দিতে চায়। অস্তিত্বের নানা টানাপোড়েনে বাজয় এই নীরব অন্ধকারে সত্তা আর প্রতিসত্তার দ্বন্দ্বগুলি গল্পে ঘনিয়ে তোলে নাটক। যে সব বেঁচে থাকা মৃত্যুরই মতন, আবার যে সব মৃত্যু বেঁচে থাকার মতো স্বস্তির পরিসর দেয়–পীযূষের গল্পে সেই উভমুখী টানই যেন মূলধন। অন্ধকারের দ্বন্দ্বের মতোই মৃত্যুও পীযূষের গল্পের এক ধ্রুবপদ। 'তদন্ত সাপেক্ষ একটি কাহিনী' গল্পের সোমনাথ ভেবেছিল, 'বেঁচে থাকার সাথে সাথে যেমন মৃত্যুও ঘোরে–তাই মৃত্যুকে আহ্বান করার দরকার হয় না যদি বোঝা হয়ে যায়, সে তো প্রতিদিনের জীবনযাপনের মধ্যে আছেই।' তাই বাস অ্যাক্সিডেন্টের পরেও বেঁচে যাওয়া সোমনাথ নবজন্মের উদ্‌যাপন করে না; বরং নদীর গা ধরে কুয়াশার ভেতর ঢুকে যেতে যেতে ভাবে 'নির্জনতার খোঁজেই কি সে এত দূর চলে এসেছে। যেভাবে বন্য হাতিরা চলে যায় অরণ্যের নির্জনতম স্থানে–মৃত্যুর আগে।' যার নিজের শিশুটিকে রাষ্ট্র সংরক্ষণ করেছিল প্রসূতির অবচেতন মনের ক্রিয়া কীভাবে গর্ভস্থ সন্তানের ওপর পড়ে তারই নমুনা হিসেবে সেই কিন্তু দুর্ঘটনাগ্রস্ত আরেকটি শিশুকে পরম যত্নে তুলে দেয় সহযাত্রিনীর হাতে। রাষ্ট্রেরই সন্ত্রাসে থানার লক-আপে চুরুট দিয়ে নখ পুড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তার স্ত্রী স্বপ্নার কড়ে আঙুলটা তির তির করে কেঁপেছিল; পুলিশ ইনস্‌পেক্টরের জুতোর সঙ্গে চলে এসেছিল সেই কড়ে আঙুল–স্বপ্নে শুধুই সেই মস্তিষ্ক থেকে ছুটন্ত কড়ে আঙুল! আর সদ্যজাত শিশুরও বাঁ হাতের লম্বা কড়ে আঙুলটি পেঁচিয়ে বসেছিল শিশুরই গলার ওপর! রাষ্ট্র যখন তা সংরক্ষণ করে–তখন সেই শিশু কি প্রতীক হয়ে ওঠে না? রাজনৈতিক ছোটগল্পে ব্যক্তির ট্র্যাজিডির জন্য রাষ্ট্রই তো অবতীর্ণ হয় নিয়তির ভূমিকায়। তাই যে পুরাণকে লেখক অনেক গল্পেই সামূহিক স্মৃতির বহতা সুর হিসেবে রেখে আবহমান আর বর্তমানের মধ্যে সংযোগ নির্মাণ করেন এই গল্পে তার একটি চমৎকার বিপ্রতীপ নির্মাণ চোখে পড়ে–'এই ছিন্ন কড়ে আঙুল থেকে কোনও পীঠস্থান তৈরি

হয়নি একথা যেমন ঠিক, আর হবার কথাও নয় কেননা যে নারী একবার পুলিশ লক-আপে রাত কাটিয়ে আসে আর যাইহোক আই এস আই মার্কা নয়।'

পীযূষ তার গল্পে এই যে সব মুহূর্ত তৈরি করেন, মূল কাহিনী কাঠামো যখন আখ্যানে সাজান ইচ্ছাকৃত বিপর্যস্ত বিন্যাসে তখন বোঝা যায় যে, বিষয়বস্তুর সঙ্গতির সঙ্গে এই বিন্যাস কৌশল যথার্থই সঙ্গতিপূর্ণ। 'ঠাকুমার তালপাখা ও অন্যান্য গল্প' বইটির সূত্রপাতে তিনি যখন রূপকথার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন–তখন এই আখ্যান প্রযুক্তির ভেতরকার যুক্তি আরও একটু স্পষ্ট হতে চায়। রূপকথা আর মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সংযোগ যে ঐতিহ্যবাহী মৌখিক আখ্যানের ঘরানায় লিখিত, সেই আবহ পীযূষের গল্পে বস্তুতপক্ষে যাদু বাস্তবেরই কথা মনে করিয়ে দেয়। 'ঠাকুমার তালপাখার হাওয়ার ভিতর', 'ভবনদীর ঘাটে' এবং 'শূন্য অথবা নকশা ফুলের সুগন্ধ'–পর পর গল্প তিনটিতে চরিত্র এবং তালপাখাটির সূত্রে রয়েছে অন্তর্গত সংযোগ। ঠাকুর দালানের ত্রিনয়নী খাঁড়া চুরি হয়ে যাবার পর দেয়ালে সেই শূন্যস্থান ভরাট করে থাকে তালপাতার তৈরি এক বিশাল পাখা। সে তালপাখা বাতাসে দাঁড়ের মতো দোলে–মনে হয়, সমস্ত যাত্রাপথ নদীপথ হয়ে যাচ্ছে। আবার অন্য গল্পে ম্যাজিক আয়নায় সেই তালপাখাই ফের হয়ে ওঠে খাঁড়া। একটি মৃত নদী হঠাৎ জীবন্ত হয়ে জনপদ ভাসায়, আবার পার হতে গিয়ে ঘাটে এসে দেখা যায়–নদী নেই, শূন্য মাঠ পড়ে রয়েছে। না, এই বিভ্রম কোনও ঘোর বা মায়াময় অতিপ্রাকৃত নয়। যে সব যন্ত্রণা প্রতিদিনের গভীরে প্রোথিত পীযূষ তারই ভাষারূপকে আরও বেশি স্পর্শকাতর করে তুলতে চান এভাবেই এসব ইঙ্গিতেরই সহায়তায়। যে জীবন অনেক দুর্বোধ্য আর অবোধ্য সমীকরণের সমাধানহীন এক জটিল ছক–স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যতে মেশা সে জীবন সহজ কোনও নিয়মহীন আর উত্তরহীন বিচিত্র হিসেব হয়েই কেটে যায়। তারই বিন্যাস আখ্যান শিল্পে ফুটিয়ে তুলতে গেলে কোনও গল্প এমন আকার তো নেবেই! ঠাকুমা সব শুনে-টুনে যখন বলেন, 'কিছু কিছু দাগ সংসারে রয়ে যায় গো–আর এই দাগগুলি নাকি ইতিহাসও হয়ে যায় একদিন' তখন বোঝা যায় বর্তমানের খণ্ডটুকু নিয়েই যে গল্প পীযূষের হাতে তা আখ্যান হয়ে ওঠে ইতিহাসের সঙ্গে যোগ রেখেই। কিন্তু আরেকটু স্পষ্টভাবেই তিনি জানিয়ে দেন–এই ইতিহাসের তাৎপর্য; যখন লেখেন 'সমস্ত প্রাচীনতার নির্দিষ্টকরণের এক-একটি পরিবারের এক-এক ধরনের পদ্ধতি থাকে। কেউ ভূমিকম্প, কেউ ভীষণ জলোচ্ছ্বাস, কেউ দুর্ভিক্ষ বা যুদ্ধ দিয়ে সময়কে বেঁধে ফেলতে চায়'–তখন বোঝা যায় ইতিহাসের এই তাৎপর্যও এসেছে তার গল্পে। লোককথা, উপকথার মতো আখ্যানে যেমন ইতিহাসই ধরা থাকে আবহমানে; পীযূষ সেই স্রোতে ডুবিয়ে তুলে পাকা রঙ ধরান তার গল্পে। মাটি হাতে নিয়ে মূর্তি গড়তে বসে আবহমানের আগুনে তাকে পুড়িয়ে শিল্পরূপ দেওয়াই তার বৈশিষ্ট্য। মান্য সংস্কৃতির দ্বারা গৃহীত মহাকাব্য যেমন তার গল্পের ভিত গড়ে; লোকায়ত সংস্কৃতির ইতিহাসও তার কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। পাঠকের কাছে এভাবেই পৌঁছে যায় নাগালের বাইরে থাকা কত বাকি ইতিহাস। পাশ্চাত্যের উর্বরতা কেন্দ্রিক মিথ-এর সঙ্গে ব্রাত্য দেশজ পুরাণ-এর জারণ-বিজারণের রহস্য পীযূষের নখদর্পণে। নদী-মাঠ-সাপ-আগুন এবং এমনই অসংখ্য প্রাকৃতিক উপাদান তার গল্পের

সৃজনভূমিতে সেই উৎসমূলের সঙ্গে যোগসূত্রটি ধরিয়ে দেয়। অস্ত্রের পরিবর্তে তিনি তালপাখার সন্ধান পেয়েছেন ইদানীং–লেখকের এই মন্তব্য কোনও কৌতুক নয়; বরং মগ্নচৈতন্যের এই রূপকার সেই যাদুর পাখাটি নিয়ে মার্কেজের মতো আমাদের সামনে আরও গূঢ় বাস্তবের সন্ধান দিয়ে যাবেন আগামীতে। পাঠক হিসেবে পীযূষ ভট্টাচার্যের কাছে এটা প্রত্যাশা।■

আধুনিক পাঠকের নান্দনিক সাময়িকী

বিকল্প

সম্পাদক:রাজীব সিংহ
আনন্দ নিকেতন
১৯/২৫, গোঁসাইটুলি লেন
গোলাপট্টি, ইংরেজবাজার
মালদহ–৭৩২১০১

পীযূষ ভট্টাচার্য, তাঁর বহুতর বাস্তব

সন্দীপ মুখোপাধ্যায়

পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্প বহুতর বাস্তবতাকে দুরূহ রূপ ধারণ করতে চেয়েছে। কাহিনী বানানোর সময় না কি ইচ্ছে থেকে নয়, বহমান সময়-পরিবেশ এবং তার অন্তঃসত্ত্বায় ধৃত সংস্কার, মিথ, ব্রতকল্প সমসময়ের রাজনীতির উপরের আবরণকে উন্মোচনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর গল্প রচনার নেপথ্য শক্তি হিসেবে ক্রিয়াশীল। সে কারণেই, এখন পর্যন্ত কাহিনী নির্ভরতায় বিশ্বাসী বাংলা উপন্যাস-গল্পে জনপ্রিয়তার সমাদর উপেক্ষা করেই আত্মজীবনের রাজনৈতিক-পারিবারিক অভিজ্ঞতাকে ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির সঙ্গে লিপ্ত রেখে ব্যক্তি, পরিবার, অঞ্চল ও তাদের পারস্পরিক টানাপোড়েনকে নিয়ে গল্প রচিত হয়। আর সে গল্পে কাহিনীগত ধারাবাহিকতাকে সক্রিয়ভাবেই ব্যাহত করা হয়, কারণ কাহিনীর ধারাস্রোত জীবনের বাঁকে বাঁকে যে চূর্ণ হয় সেই সত্যকে দেখবার বীক্ষণকোণ তৈরি করে নিয়েছেন পীযূষ ভট্টাচার্য। তৈরি হয়েছে ফর্মের উপর প্রবল এক আধিপত্য, এই আধিপত্য শেষ পর্যন্ত খুব কম গল্প-উপন্যাসের লেখকই রক্ষা করতে পারেন। পণ্য বিনিময়ের চাপ সহজ করে দেয় ফর্মের বাঁকচুর, কাহিনী গ্রন্থনের শিথিলতায় প্রশ্রয় পায় বানানো বাস্তব বা মেক বিলিভ, চরিত্রের ক্রম-অগ্রসরতা পাঠকের ক্ষণিক ইচ্ছাকে পূরণ করতে ব্যস্ত হয়। আশ্বাসের কথা, শেষতম গল্পগ্রন্থেও পীযূষ বাস্তবের স্তর বিশ্লেষণের শর্তগুলি কোনওভাবেই অগভীর হতে দিলেন না। তাঁর গল্প পাঠ পাঠকের কাছে এখনও পর্যন্ত দুরূহতাকে অনুধাবনের সক্ষমতা ও সচেতন মনস্কতা দাবি করে। বাংলা গল্পের আধুনিকতা বা উত্তর আধুনিকতার প্রান্তস্পর্শী মনন সমৃদ্ধ রূপকল্প-অন্বেষা পীযূষ ভট্টাচার্যের নিকট ঋণী।

বর্তমান আলোচনায় তাঁর চারটি গল্পগ্রন্থ–কুশপুত্তলিকা (১৯৯৫), পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্প (১৯৯৮), কীর্তিমুখ (২০০১) এবং নিরক্ষরেখার বাইরে (২০০২)–অবলম্বন করে তাঁর কাহিনী বয়নের নিজস্বতা এবং উদ্যত রাজনীতিকতার ভিতরে সংস্কারবাহিত চেতনা, মিথ, লোকায়ত সংস্কৃতির সমৃদ্ধিকে বুঝে নেওয়ার একটি বিনীত চেষ্টা উপস্থিত করা হল।

এক

'কুশপুত্তলিকা' পীযূষ ভট্টাচার্যের প্রথম গল্পগ্রন্থ। এই সংগ্রহের ভিতরে সেই চরিত্রচিহ্ন

উপস্থিত যার মধ্য দিয়ে লেখকের নিজস্বতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় সব গল্পের প্রধান চরিত্রের একটি রাজনীতির অভিজ্ঞতা ও পরিপ্রেক্ষিত লক্ষ্যণীয়। প্রথম গল্প 'কুশপুত্তলিকা' সত্তর দশকের অতি বাম রাজনীতির প্রতীক হয়ে ওঠে। মধ্যপন্থাকে যে চূর্ণ করতে চেয়েছিল সেই রমেন বহুদিন নিরুদ্দিষ্ট, নির্দিষ্ট সময়ের পরে আপন জামাতার কুশপুত্তলিকা দাহ করতে চান গল্পের কেন্দ্র-চরিত্র শঙ্করের দাদা। শঙ্করের ভ্রাতুষ্পুত্রী বড়বুড়িকে বিয়ে করেছিল রমেন। এই রমেন তার উত্তাল শপথের দিনগুলিতে শঙ্কর ও তার স্ত্রী মীরার বন্ধু ছিল। প্রথম যৌবনের সেই অগ্নিময়, ঝোড়ো দিনগুলি পেরিয়ে কলেজের অধ্যাপক। এক স্থির জীবনের মধ্যে বসবাসকারী শঙ্করকে দাদার ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর কাছে যেতে হয় রমেনের প্রতীকী কুশপুতুল বহনের জন্য। কারণ, মৃতের শ্রাদ্ধ না করার অমঙ্গল তার উত্তর-প্রজন্ম, ছেলেমেয়েকে, স্পর্শ করতে পারে–এই আশঙ্কা। অন্যদিকে বড়বুড়ি অনুচ্চারিতভাবে এই সংস্কারবাহিত আচারকে মেনে নিতে পারে না। রমেনের আদর্শ যে এখনও জাগ্রত, এই ইঙ্গিত তার শান্ত প্রতিবাদের ভিতর তাপ ছড়ায়। গল্পের শেষে রমেনের কুশপুত্তলিকা বহন যেন ব্যর্থ প্রতিশ্রুতি ও আপসবিনীত জীবনের কুশপুত্তলিকা বহনের প্রতীক হয়ে ওঠে। এই গল্পে সংস্কারের পাশাপাশি লোকায়ত মোটিফের ব্যবহার চকিতে আসে, মীরা ও ঝুমার নিবিড় কথাবার্তার সঙ্গে ব্রতকথার সামিপ্যে। এই 'কুশপুত্তলিকা' গল্পের রমেনের আপসহীনতার অসাফল্য, বড়বুড়ির গুণ্ঠিত সমর্থন। শঙ্করের মেনে নেওয়ার ভিতরে জেগে থাকা বিক্ষতবোধ পীযূষ ভট্টাচার্যের সমগ্র শিল্প-চেতনার প্রতিফলক হয়ে ওঠে।

'ক্ষরণ' গল্পে সাম্প্রতিকতা আর ইতিহাস মিলে যায়। একদিন যে রিতার মর্যাদা হনন করেছিল সেই সান্টুর মৃতদেহের খোঁজে আসা শকুন আহত করে রিতার পৃথক করে দেওয়া দাদার মেয়ে টিংকুকে। টিংকুর রক্তক্ষরণের ভিতর দিয়ে রিতা আর বৌদি গায়ত্রীর সহমর্মিতা তৈরি হয়। যুদ্ধ, আত্মরক্ষা, হনন আর পর্যুদস্ত ব্যক্তিকে তার ইতিহাসের পটে স্থাপিত করেন পীযূষ–'শতাধিক বছরের আয়ুষ্কালের অভিজ্ঞতায় শকুন যেভাবে পায় মৃতের সন্ধান, তার প্রকরণ পদ্ধতি যতই রহস্যাবৃত থাকুক না কেন–তা যেন অলৌকিক হয়ে ধরা পড়ে প্রতিটি শকুনের আকাশ থেকে নেমে আসার ক্ষেত্রে। তখন মানুষের খাড়া হয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গির লক্ষ লক্ষ বছরের ইতিহাস বাতিল করে একটা মানুষ মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। অথচ জন্মাবার সময় ছিল তার হাতের আঙুলগুলো আঁকড়ে ধরবার ভঙ্গিতে বাঁকা। যুদ্ধ ও আত্মরক্ষা কেমন যেন একাকার হয়ে যাচ্ছে...'। এই প্রায় প্রবন্ধধর্মী পংক্তিগুলির সঙ্গেই এক নিঃশ্বাসে লেখা হয়, 'এরই মধ্যে শোনা যায় সদরের দরজায় কড়া নাড়বার শব্দ।' শকুনের আক্রমণের প্রতীক-বাস্তবের গ্রথিত উপস্থাপনায় আক্রমণ ও আত্মরক্ষার পরিস্থিতিকে যেমন তুলে ধরতে চান পীযূষ, একইভাবে লৌকিক ও অলৌকিকের টানাপোড়েনের মনস্তত্ত্ব উত্তরাধিকার রচনার পরিস্থিতিকে তৈরি করে 'ভাসান' গল্পে। লুকাক্চ তাঁর 'ইতিহাস ও শ্রেণীচেতনা' মহাগ্রন্থের 'শ্রেণীচেতনা' অংশে আলো-ফেলা মন্তব্যে জানান–`The question of consciousness may make its appearance in terms of the objectives chosen or in terms of action, as for instance in the case of the petty bourgeoisie. This class lives at least in part in the capitalist big city and every aspect of existence is directly exposed to the influence of capitalism. Hence it can not possibly remain wholly unaffected by the fact of class conflict between bourgeoisie and proletariat.' পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী চরিত্রের নেতিবাচকতায় আক্রান্ত বিভাস বিনির মুখের 'অলৌকিক তত্ত্বকথা' শুনে 'তোমাদের দেবী তবে কেবল বুর্জোয়া তৈরি করে' এই উত্তর দেয়। কারণ দেবী যে শাঁখারির কাছে শাঁখা পরেছিলেন সেই শাঁখারি ক্রমে চালকল, ট্রান্সপোর্ট, নানান ব্যবসায় ভোল পাল্টে ফেলে। আবার ভাসানের পর মিলনের প্রাচীন রীতির বাইরেও বিভাস যেতে পারে না। তার দোলাচল তাকে বিবমিষার শিকার করে। 'বৈতরণী' গল্পে প্রাচীন হিন্দু সংস্কারের সমান্তরালে রাখা হয় শ্রেণী ঘৃণা থেকে জন্ম নেওয়া এক হত্যা। হননকারী নিজেই বৈতরণী পার করতে নিয়ে যায় বাছুর। কিন্তু তৃষ্ণায় শেষ পর্যন্ত বাছুরটিকে বিজয় ছেড়ে দেয়। হরিশঙ্করকে হত্যা কি শ্রেণী ঘৃণা? তার স্ত্রী, যার সঙ্গে বিজয় হরিশঙ্করের বিবাহ দেয়, মুকুটের ভিতর দিয়ে এক বিমূঢ়তা তৈরি করে। সংস্কারের আর একটি চেহারা 'ভগ্নাংশ'। যেখানে সেন্টিমেন্ট, পারিবারিক 'রিয়েল পলিটিক্স', রাজনৈতিকতা, শ্রেণী ঘৃণার প্রকাশ একটি গল্পের বয়নে জটিলতা এনেছে। আজকের বাস্তবের কাঙ্ক্ষিত জটিলতা। একনায়কত্বের প্রতীক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এবং তাঁর প্রতিবাদী ছেলে শৈবাল, প্রশ্নময় দুর্গা এবং শচীন জ্যাঠার কর্তৃত্বপরায়ণতা সমকালের চেহারাকে ফুটিয়ে তোলে। আর এর ভিতরে চাপা অর্জুন তার প্রসঙ্গ এবং তার ও শৈবালের সেন্টিমেন্ট ও তার আঘাত থেকে বিচ্ছুরিত আত্ম-সংকট এক বামপন্থী কর্মীর সত্তাকে স্পষ্ট করে। পাশাপাশি একটু সহজ বয়নের গল্প 'অংশুমোহনের আগামী কয়েক বছর'। এখানে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী অংশুমোহনের আর জীবিকা থেকে স্বাস্থ্যের কারণে অবসর নিয়ে বুলুর বেকারিত্ব ঘোচানো সম্ভব হল না। বুলুকে বদ্ধ দরজার ওপারে আত্মহননের স্তব্ধ প্রতিবাদ মেনে নিতে হল।

'জঠর' গল্পের হিরন্ময় এক অন্য রকম অপরাধী চরিত্র। নিজের স্ত্রী সন্তান হিসেবে তার কাছে আশ্রিত অতুলের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে। অতুলের সন্তানের মা হতে দেয়নি সে স্ত্রী সুষমাকে। তার সঙ্গে ফুলির অবৈধ সম্পর্কের সঙ্গে সুষমার অস্তিত্ব জড়িয়ে গিয়ে বিমূঢ় করে হিরন্ময়কে।

'দহন' গল্পটির শুরুতে রূপ কানোয়ারের সতী হওয়ার প্রসঙ্গ। বনেদী বাড়ির ছেলে বিকাশের সপ্তপুরুষের মধ্যে যিনি তৃতীয় তাঁর স্ত্রীও সতী হয়েছিলেন। সেই সতীর সিঁদুরের মাদুলি 'বিকাশের মা, বৌদি, কাকিমার গলায়। বিকাশের স্ত্রী জয়তী ব্রাহ্মণ নয়। অসবর্ণ বিবাহ বিকাশের বাবাকে আতঙ্কিত করে। তাঁর কাছে জয়তী সিঁদুর পাওয়ার যোগ্য নয়–'ও বিকাশের স্ত্রী নয়, রক্ষিতা'। জয়তী রূপ কানোয়ার বিষয়ে উদাসীনতা দেখায়, কিন্তু সদ্য নিযুক্ত কাজের মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা। জয়তীকে গোপন করে কাজ নিয়েছে। তাকে বিতাড়িত করতেও ভয় পায় জয়তী। বিকাশের মনে হয় 'এ মহিলা যদি সতী হয় যদিও তা কখনও সম্ভব নয় তবুও জয়তী কি তার সিঁদুর সংগ্রহের আগ্রহ দেখাবে?' 'চক্ষুদান' গল্পে পারিবারিক

সংস্কার ও আশ্রিতের আত্মদান এক গভীর সংবেদনা তৈরি করে। এখানেও প্রধান চরিত্রের দ্বন্দ্ব-দীর্ণ ব্যক্তিত্ব, মানিকের জলে ডোবা, চক্ষুদানের সংস্কার বহুস্তর বাস্তবে পীযূষের নিবিষ্টতার পরিচয় দেয়।

'দণ্ডকলসের ফুল' আজকের রাজনীতির কপটতাকে খুলে দেয়। বাবুলের সর্পাঘাতে মৃত্যু নিশ্চিত করে ছোট শহরের হাসপাতালের অব্যবস্থা। বিকল্প হতে পারত 'দণ্ডকলসের ফুল'–যার ক্রিয়াশীলতার সংস্কার বাবুলের বাবার ভিতরে কাজ করলেও নির্বংশ হওয়ার চাপা ভয় সেই ওষুধ থেকে বিরত করে তাকে। আর সমস্ত ঘটনার নিয়ামক হয়ে ওঠে অমানবিকতার রাজনীতি : – কৈশোরেও যার পীড়ন থেকে সে মুক্তি পায়নি।

দুই

পীযূষ ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্প' (১৯৯৮)। এই সংগ্রহের গল্পগুলিতে কাহিনী চরিত্রের বিষয়ে লেখকের প্রতিসরণ লক্ষ্য করা যায়। 'মাছ'-এর আর্কেটাইপ এই গ্রন্থের দুটি গল্পে সংস্কারবাহিত চেতনাকে আলোকিত করে। 'মাছ' এবং 'ছোঁয়া বড়শি' দুটি গল্পেরই পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে পীযূষ তাঁর বালুরঘাটের পটভূমি ও বাল্য-কৈশোরের অভিজ্ঞতার বীজকে পাঠক দৃষ্টিতে আনতে চান। সতীর মাছ মারার কৌশলের অনুপুঙ্খকে তিনি চিনতে চান নিজস্ব অভিজ্ঞতার অংশ হিসেবেই। 'মাছ' গল্পের শুরু এইভাবে :

> পদ্ধতিগত আপত্তি সত্ত্বেও সে দেড়ফুটের মতন বাঁশের খণ্ডটি ছুঁড়ে দেয়, তারপর তারই উপর জাল ফেলে। এই পদ্ধতির প্রথাগত নাম 'বাজ ফেলা'। কার্যত বাঁশের খণ্ডটি টোপ হিসেবেই শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে ছুঁড়ে মারা–জল ও বাঁশের খণ্ডটির সংঘর্ষে উৎপন্ন শব্দ, শব্দে মাছ আসে, বিশেষ করে রাই মাছ। যা ধরবার এখনই সময়–আর এ হচ্ছে সহজতম কৌশল।

পাঠকের মনে হতে পারে, শচীর মাছ ধরার 'সহজতম কৌশলের' এই বিশ্লেষণী বিবরণের মধ্যে দিয়ে গল্পলেখক নিজস্ব শিল্পকৌশল, প্রকরণের ব্যবহারে বাস্তবের বহমানতা থেকে উদ্দিষ্টকে তুলে আনবার মারপ্যাঁচটিকে গোপনে বুঝিয়ে দিলেন। যে শচীর কথা তিনি লেখেন তার সম্পর্কে পীযূষের মন্তব্য : 'মাছ, মাছ ছাড়া সর্বস্ব গল্পহীন শচীর কাছে।' এভাবেই মাছের উপর প্রস্বর দান এই আর্কেটাইপের শিল্পগত গরিমাকেই চিহ্নিত করে। শুধু শচী নয়, তার সঙ্গী নিত্যও মাছের জীবিকা ছেড়ে লোভনীয় স্মাগলিংয়ের কাজকে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ মাছের সঙ্গে সম্পর্ক তার শুধুই জীবিকা নয়–

> সখীচরণ আর দাঁড়ায় না। নিত্য তার আদিমতাকে টিকিয়ে রাখে

> এভাবে। তার জীবনের সংস্কার, জাল, ডিঙ্গি ইত্যাদি থেকে বিচ্যুত না হয়ে সে কেবলই ভাবে নদী, রাইমাছ, দুঃখকষ্ট, হাটবাজার, বিধিলিপি এবং ইত্যাদিতে মগ্ন থাকতে থাকতে সে তার নিজের অস্তিত্বের কথা ভুলে যায় একসময়।

নিত্য এবং শচীর মধ্যে অস্তিত্বের যে অংশে 'দুঃখকষ্ট' বা 'হাটবাজার' সংযুক্ত সেই অংশের দিক থেকে একটি পার্থক্য থেকে যায়। মাছ, শুধুই মাছ স্বপ্নের ঘোরে আলোড়িত করে শচীকে। দহের বাতাস আর অন্ধকারের ভিতরে সে তার ঠাকুরদার কাছ থেকে পায় চিংড়ির ছইয়ের নৌকা। তার এই বাস্তবের চেষ্টা ও হেরে যাওয়া এবং স্বপ্নের ঐশ্বর্য মিলে ম্যাজিক রিয়ালিজমের আবহ রচিত হয়। অন্যদিকে, রঁলা বার্থে যে বলেছিলেন–'to read a narrative is not only to pass from one word to another, it is also to pass from one level to another.' সেই স্তর থেকে স্তরান্তরে নিয়ে যাওয়ার শিল্পসাধ্য কাজটিতেও পীযূষের দক্ষতা স্পষ্ট হয়। ছোঁয়া বড়শি গল্পেও জগতের সৈন্য বিভাগের অতীত, তার আঘাত, সরমার গর্ভে সন্তান দানের অসামর্থ মাছ ধরার পটভূমিতে তার মালো-বংশের গরিমা ও ক্রোধকে, চেষ্টা ও সফলতাকে রূপায়িত করে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে, সরমার আত্মহননকে যেভাবে ফুটিয়ে তোলেন পীযূষ সেটি শিল্প প্রকরণের উপর দক্ষতা ছাড়া সম্ভব নয়।

'বোধনপর্ব' গল্পটি তুলনায় দীর্ঘ। অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে রাজনীতির শঠতাকে তুলে এনেছেন গল্পকার। সত্যসুন্দর নামের নেতাকে গর্ভগৃহের অন্ধকার আক্রমণ করে। এ যেন সত্তার ভিতর থেকে উঠে আসা অবচেতন ভীতির আক্রমণ। অন্যভাবে বলা যায়, অস্তিত্ববাদীরা যাকে অ্যাংগাস্ট বলেন সেই যাতনা বহে বেড়াতে হয় সত্যসুন্দরের। সাফল্যের বাইরের চেহারা বজায় রেখেই এটি করতে তিনি বাধ্য। সত্যসুন্দরের বিপরীতে যেন বাংকার চরিত্র। বাংকা 'বর্গাদার নয় কিন্তু কোন এক সময় বর্গাদারের মতন কিছু একটা ছিল যেহেতু তার নামে কোন ভেস্ট ল্যান্ডের পাট্টা নেই। এইসব সংজ্ঞার নীচে মানুষজন পশুর মতো স্বাধীন। এই স্বাধীনতাই বিপজ্জনক।' বাংকা মধ্যবিত্ত-নির্ভর রাজনীতি চেতনার কাছে তৈরি করে এক বিপদ। তাই তার আচরণের কাছে হেরে যেতে হয় চিহ্নিত জমির হিসেবকে। শুধু রিক্ত মাঠের বুকে ক্ষত তৈরি করে জল আনবার শ্রমে তার অস্তিত্ব উৎসবের আলোড়ন আনে। তবু মানুষের স্বাধীনতা বা প্রাতিস্বিক অস্তিত্বে জেগে থাকা প্রতিরক্ষার সংস্কার তাদের আলাদা করে দেয়–'সব কটি মানুষই যেন প্রবল বৃষ্টিতে মাটির মতন তালগোল পাকিয়ে যাবে, এই আশঙ্কায় এক সময় পৃথক হয়ে যায়।'

সাম্প্রতিককালের একটি সামাজিক প্রবণতা গণপ্রহার–যা গণ হিস্টিরিয়ার লক্ষণ বলে সমাজবিদরা ধারণ করেন–বিশেষ একটি পরিস্থিতি তৈরি করে 'দহ' গল্পে। তন্ত্রসিদ্ধ লকেটের জন্য শিবনাথের চেষ্টা ও সেটি ছিনতাই করে তাকে গণপ্রহারে হত্যা একই সঙ্গে চরিত্রের নিহিত ত্রাস-সংস্কার ও আক্রামক স্বভাবের প্রতিফলক। সন্তানের জন্য আকাঙ্ক্ষার যে রেকারেন্ট, মোটিফ পীযূষের গল্পের বৈশিষ্ট্য সেটি এই গল্পের মানবিক স্পন্দনটি জাগিয়ে

রাখে। গল্পের শেষে আমরা পড়ি, একদিন দহের ভিতরে লকেট আবার কয়েকশ বছর পরে উঠে আসবে। তখন এই চরিত্ররা মুছে গেছে। লেখকের ভাষার নিজস্বতায় 'কারও কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না, শুধু পাওয়া যাবে নিজস্ব রক্ত পানে একটি সভ্যতার ইতিহাস।'

'গারসি সংক্রান্তির কাক' গল্পেও অনেকগুলি স্তর পাশাপাশি লিপ্ত হয়ে থাকে। সুধীন্দ্রনাথ ও কণিকার পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে কাককে ভাত খাওয়ানো সুধীন্দ্রনাথকে সেই স্মৃতিতে বিদ্ধ করে যার ভিতর দিয়ে জেগে ওঠে খৈমুদ্দিন যে একবার জলের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল সুধীন্দ্রকে। এরই পাশে অতি বাম আন্দোলনের সংগ্রামী মানিক। সে মস্তিষ্কে গুলি নিয়ে তেইশ বছর বেঁচে। অবশেষে তার মস্তিষ্কে বিস্ফোরণ ও সুধীন্দ্রের শেষ কাকটিকে ভাত দিতে না পারার ব্রতভঙ্গ এক বড় বেদনার কাছে পৌঁছে যায়। পুরনোরা একেই হয়ত বলতেন, রোমান্টিক অ্যাগনি। দোঁহা গল্পটিতে হিন্দি বলয়ের রাজনীতির অভিঘাত। যদিও কাহিনী মন্তাজ রীতি মেনে চলায় দুরূহ বলে মনে হয়েছে। 'পদস্খলন' শব্দটি মধ্যবিত্তের জীবনযাপনের সুবিধাবাদের বহুমাত্রিকতা খুলে দেয়।

এই গল্প সংগ্রহের শেষ গল্প 'চিরাগ'। কথকের স্ত্রী একটি ছেলেধরাকে বাড়িতে আশ্রয় দেয়। চন্দনরা তাকে টেনে নিয়ে যায়। সে নিহত হয়। এই সামাজিক ঘটনার সঙ্গে মিলে যায় প্রেমিক যুবকের প্রেমিকাকে পাবার উদ্দেশ্যে চিরাগের বাতি জ্বালানোর ব্রতকথার আবহমানতা। মানুষকে আশ্রয় দেবার মধ্যে যে বৃহত্তর মানবতা সেই চিরাগের প্রতীকের মধ্যে প্রতিফলিত তাকে ফিরে পাওয়া যায় 'চিরাগ' গল্পে। প্রেমের বেদনা আর মানবিকতার ব্যঞ্জনা একটি বিন্দুতে মিলে যায়। 'চিরাগ' হয়ে ওঠে সম্প্রদায় চেতনার বিরোধী একটি গল্প। অন্যভাবে প্রেমেরও গল্প।

তিন

কীর্তিমুখ (২০০১) পীযূষ ভট্টাচার্যের তৃতীয় গল্পগ্রন্থ। প্রথম গল্প 'কীর্তিমুখ' রাজনৈতিক রোমান্টিক গল্প। উগ্রপন্থী আন্দোলনে অংশগ্রহণের ফলে শান্তনুর জেল হয়েছিল। একদিন ছাড়া পায়। দীর্ঘদিন পরে স্ত্রী গীতির কাছে আসে। এই সময় পর্বে একমাত্র কন্যা কিশোরী হয়ে ওঠে। কিন্তু উপদলীয় সংঘাতে শান্তনুকে স্ত্রীর সান্নিধ্য ছেড়ে একা গ্রামের বাড়িতে চলে যেতে হয়। শান্তনুর কন্যার কাছে এক সময়ে বাবার সংগ্রহ করে আনা প্রাচীন পাথরের মূর্তির কীর্তিমুখ অংশটি রুচির অংশ হয়ে ওঠে। তার স্ত্রী গীতির কাছে এই কীর্তিমুখের অর্থ হল 'জীবনের জীবন সংহার করে' বেঁচে থাকা। তারপর একদিন গীতি শান্তনুর পরিত্যক্ত বাড়িতে যায়। ফেরার পথে যানবাহন না পেয়ে আবার ফিরে আসতে হয় শান্তনুর কাছে। কিন্তু তাদের সহবাস চরিতার্থতা পেল না–কীর্তিমুখের মতো জীবনের জীবন সংহার করেই ভালবাসা অপূর্ণ থেকে যায়।

'অলৌকিক পাণ্ডুলিপি' ঈষৎ কবিতার প্রান্তস্পর্শী গল্প। পীযূষের সাহিত্য জীবন যে সক্ষম কবিতা রচনাতেই শুরু সেটি তাঁর এই গল্পের চিত্রকল্প তৈরির মধ্যে স্পষ্ট। সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে রেখে দুর্ঘটনায় বন্ধুর মৃত্যু হল। সেই বন্ধুর সঙ্গে আবার কথকের স্ত্রীর

সঙ্গে প্রণয়। এই প্রণয় নিয়ে আসে দ্রৌপদীর অনুষঙ্গ। বিকাশের ডায়েরি পাঠে কথকের অনুভব...এতক্ষণে ডায়েরির প্রতিটি অক্ষর ছুঁয়ে যেতে কখনো কখনো পাথরের মতন ভারী কখনো বা নির্ভার হয়ে অস্তিত্বের অন্তর্লীন চারণভূমিতে হেঁটে চলে যাচ্ছি শুধু।

বাংলা ভাষায় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী যে গল্পগুলি লেখা হয়েছে, 'পচন প্রক্রিয়া'- কে আমি তাদের মধ্যে অন্যতম স্মরণযোগ্য গল্প বলতে চাই। সুকমল জাহানারাকে বিবাহ করে। জাহানারাকে অবশ্য হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে হয়। বেশ। অনেক দিন পরে তাদের পুকুরে মাছ পচে যায়। নেপথ্যে তাদের বিবাহের প্রতিস্পর্ধী কোন সাম্প্রদায়িক শক্তির উপস্থিতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আজকের সময়ের আপাত নিয়ামক সমাজবিরোধী মাস্তানদের নিয়ে লেখা গল্প 'সিরাজউদ্দৌল্লার পুত্ররা'। হনন ও আত্মহনন এই গল্পে আজকের বিকার আর কাপট্যের তীক্ষ্ণ এক শিল্পরূপ রচনা করেছে।

'সিজলি মার্ডির পৃথিবীতে চিতাবাঘ' গল্পে পড়ি অন্ত্যজ রমণী সিজলিকে অত্যাচারিত হতে হয় মোটর বাইক আরোহী হারু বিশ্বাসের কাছে। মোটর বাইক আরোহীর বাইকে চাপার সঙ্গে চিতাবাঘের পিঠে সওয়ার হওয়ার উপমা আদিম অন্ধ-শক্তির উপমা হয়ে ওঠে। সিজলিকে দাঁড়ানো সাপের পাহারা দেওয়া, তার সিজলি মাটি হয়ে যাওয়া, সাপের মৃত্যু, আর সাপের মৃত্যুর পরে সিজলির আচরণ স্বামীর জন্য করা আচরণের সঙ্গে মিলে যায়। সমগ্র গল্প জুড়ে আদি প্রতিমার ক্রিয়াশীলতা গল্পকে অন্য এক স্তরে উন্নীত করে। সংস্কার বাহিত মানুষের আচরণকে ঘিরে তৈরি হয়েছে 'রমাকান্তর সরলা উপাখ্যান' গল্পটি। লোকাচার, সংস্কার, গহনশায়ী অন্ধকারের আধিপত্যে রমাকান্তর চরিত্র ধারণ করে রাখে আবহমান সেই অন্ধকার। দল আর প্রশাসনের টানাপোড়েনের পরিপ্রেক্ষিতে ভকিল নামক নির্বিবেক ধনী অন্ত্যজ বালকদের দত্তক নিয়ে তাদের কৃষিমজুরে পরিণত করে। মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার এই আধিপত্যকে নিয়ে লেখা গল্প 'প্রাগৈতিহাসিকের পর'। এই ব্যবস্থায় বি ডি ও শঙ্কর নির্বাক হয়ে যায়, কারণ 'এই ধরনের মধ্যযুগীয় কাজকারবার শঙ্করের চিন্তার মধ্যে ছিল না। তার প্রেসিডেন্সির রক্ত মাথায় উঠে আসছে দ্রুত। আধুনিক যুগ এরকম বর্বরতা সহ্য করতে নারাজ, কিন্তু শঙ্করের আধুনিক ভদ্রলোকীয় মন রাগ সংযত করতে রপ্ত করেছে।' প্রাগৈতিহাসিকের ভিখু তার ক্ষতস্থান থেকে মাছি তাড়াত না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকার গ্রহণ করে পীযূষ ভট্টাচার্যের মধ্যবিত্তের উপায়হীনতার কথা লেখা ছাড়া আর বিকল্প থাকে না।

চার

'কীর্তিমুখ'-এর শেষ গল্প 'কোরবাণী' পরবর্তী গল্প সংগ্রহ 'নিরক্ষরেখার বাইরে'-র (২০০২) প্রথম গল্প বা 'নিরক্ষরেখার বাইরে'-র পূর্বলেখ। কামালের আরোগ্যের জন্য কোরবাণীর উট আনা হয়েছিল। কিন্তু অসুস্থ কামালকে নিয়ে হাওড়া থেকে মালদা আসবার পথে অ্যাকসিডেন্ট, কামাল আর বাঁচেনি। বাচ্চুমিয়া ফিরে এল হাসপাতাল থেকে। ততদিনে

উটটা স্বচ্ছন্দে বাড়িতে চলাফেরা করছে। এই কাহিনীর উপর বর্তমানের রাজনীতির অভিঘাত থেকে তৈরি হল 'নিরক্ষরেখার বাইরে'–এই দীর্ঘ গল্প। রাজনৈতিক নেতার চাপে উটকে আবদ্ধ রাখতে হয় বাচ্চুমিয়ার। এই কাহিনীতে অন্ত্যজ টুনির উপর অত্যাচার এবং এম এল এ সুনন্দার প্রতিক্রিয়া ও তার ভিতরের আলোড়ন আজকের ভুলগুলির অন্তর্মূল পর্যন্ত দেখিয়ে দেয়। কাজী সাহেবের মেজবিবির উটের পিঠে পালিয়ে যাওয়া আর বাচ্চুমিয়ার চশমার ভিতর দিয়ে সুনন্দাকে গর্ভে ধারণ করবার জন্য সুনন্দার মায়ের দণ্ডি কেটে এগিয়ে যাওয়া একই অনুভবের প্রান্তভাগকে স্পর্শ করে। 'শিবশঙ্করের স্ত্রীর প্রেমের গল্প' একটা চাপা-শ্বাসরোধী আবহাওয়াকে ধরে রাখে। সংস্কারবাদী শিবশঙ্করের সঙ্গে গীতির বিবাহের কিছু দিন পরে শিবশঙ্করকে 'করসেবায়' যেতে হয়। পথে 'খাদানে' জিপ উল্টে শিবশঙ্কর মারা যায়। অবশ্য তার মৃত্যুর পাশে একটি জিজ্ঞাসার চিহ্ন রয়ে যায়। গীতির আইনি সাহায্যকারী চয়ন এবং গীতি শিবশঙ্করের উপস্থিতি আজ বোধ হয় চায় না–'কেননা গীতির গর্ভে তাদের সন্তান বড় হচ্ছে।' পুলিশ, যোষিৎ, চোরাকারবারে বিক্ষত পরিবেশ রচনায় এক তীব্র মনস্কতার পরিচয় পাওয়া গেল এই গল্পে।

সন্তানের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণে অতিলৌকিকের আশ্রয় গ্রহণের থিমের উপর 'আফাজ গাজীর মাদী ঘোড়ার কিসসা অথবা নিমফুলের মধু' গল্পটি গড়ে উঠেছে। আবার এরই সঙ্গে যুক্ত হয় রাজনীতির বক্রতা। আর সব কিছুর উপর রহস্যের এক অন্ধকার স্তব্ধতা ও গাঢ় আধিপত্য বিস্তার করে আফাজ গাজী। মুকুন্দর পুরুষত্বহীন রাজনৈতিক পৌরুষ আর রমলার শারীরিক সংবেদন পরিপূরকতা চায় যেন মুকুন্দর ব্যর্থ রাজনৈতিক বর্তমান ও সম্ভাবনাময় অতীত থেকে। গল্পের উপসংহারে পীযূষ লেখেন–

> 'দোলনা এবারে আরও ওপরে। সেখানে দেখে বাঘের পিঠে আফাজ গাজী, পিছনে এক চম্পাবতী না রমলা? রমলা কিনা স্পষ্ট দেখবার জন্য পৃথিবীর বুকের ওপর পা দিয়ে ঠেলা মেরে আরও ওপরে এখন, শূন্যে কেউ নেই, না গাজী, না চম্পাবতী বা রমলা। আশ্চর্য এক দেশ, সেখানে শান্ত এক জলাশয়ের ধারে আফাজ গাজীর মাদী ঘোড়াটিকে রণসজ্জার জন্য সাজিয়ে নিচ্ছে অচেনা এক যুবক। নীচে জনতা অপেক্ষা করতে থাকে শূন্য থেকে মুকুন্দ-র নেমে আসবার সময় ক্ষণটির জন্য।'

সত্তরের রাজনৈতিক হিংসার পরিপ্রেক্ষিতে মিথ-আর্কেটাইপের ব্যবহারে 'দলছুট' গল্পটি এই সময়ের প্রধান একটি অভিজ্ঞান। দলছুট সাইবেরিয়ান ক্রেয়ন ও অবিনাশের পরিপূরক পরিচয় কিংবা প্রতীকতা ম্যাজিক রিয়ালিজমের বাস্তব স্পৃষ্ট রহস্যের আবহে নিয়ে যায় পাঠককে। পরশুরামের পুরাণ-অনুষঙ্গের ব্যবহারে এক প্রখর আবহ সঞ্চারিত হয়। যা জলাভূমির কাছে পরশুরাম ও অবিনাশ উভয়কে আসতে হয়। তাকে ঘিরে তৈরি হয় এক বহুস্তর প্রতীক। অন্যদিকে 'দলছুট' শব্দটি কথকের ছিন্ন রাজনৈতিক আইডেনটিটির পরিচায়ক হয়ে ওঠে। হনন ও নিঃসঙ্গতা সমগ্র গল্পটি ঘিরে রচিত স্তব্ধতাকে প্রলম্বিত করে। কথক

দেখতে পায়–'অবিনাশের পরিত্যক্ত ডিঙি সাইবেরিয়ান ক্রেয়নকে নিয়ে হঠাৎ ছায়া এবং তা একসময় জলাভূমির সঙ্গে একাকার হয়ে গেল। জলাভূমির অসংখ্য রেখার সামনে দাঁড়িয়ে গীতি অবিনাশ।'■

উল্লেখ :

১. ক্লাশ কনশাসনেস। হিস্ট্রি অ্যান্ড ক্লাশ কনশাসনেস। লুকাক্চ, গেঅর্গ। পুনর্মুদ্রিত ১৯৮৩। পৃ ৫৯।

২. পোয়েটিকস অব দ্য নভেল। স্ট্রাকচারালিস্ট পোয়েটিকস। জোনাথান কার্লার। ১৯৭৫। পৃ ১৯২ থেকে বার্থের উদ্ধৃতিটি নেওয়া।

অলোক গোস্বামী 'র তৃতীয় গল্প সংকলন

বাংলা আকাদেমি প্রদত্ত সোমেন চন্দ স্মৃতি পুরস্কার (২০০৫) প্রাপ্ত

আগুনের স্বাদ

পুনশ্চ

৯ এ, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯

ভিন্ন ধারার কথক পীযূষ ভট্টাচার্য

নিত্যানন্দ ঘোষ

ভিন্ন ধারার কথাকার হিসেবে যাঁরা পরিচিত পীযূষ ভট্টাচার্য তাঁদেরই অন্যতম। গত দু-তিন দশক ধরে ব্যতিক্রমী এই কথাকার পাঠক সমাজে পরিচিত হয়েছেন, সমাদৃত হয়েছেন তাঁর অনবদ্য গদ্য লিখনের জন্য। থাকেন সুদূর বালুরঘাটে। আত্রেয়, পুনর্ভবা ও টাঙ্গন এই তিন নদীর ভাঙাগড়া তিনি দেখেছেন সেই ১৯৫৮ সাল থেকে। ওই তিন নদীর তীরে গড়ে ওঠা জনপদের জীবনপ্রবাহের সঙ্গেও তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছেন। জনজীবনের ভাঙাগড়ারও তিনি সাক্ষী থেকেছেন প্রায় অর্ধশতক ধরে। তাঁর ভাল লাগা, না-ভাল লাগা, ভালবাসা, না-ভালবাসা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যক্তি জীবন-সমষ্টি জীবন, পাওয়া, না-পাওয়া, স্বপ্ন দেখা, স্বপ্ন দেখানো আত্রাই-পুনর্ভবা-টাঙ্গনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জনপদকে ঘিরেই।

পীযূষ ভট্টাচার্য অনায়াস দক্ষতায় তাঁর নিজস্ব অনুভূতিতে আত্রেয়ী নদীর মতো বয়ে যাওয়া জীবনস্রোতকে কল্পনার তুলিতে বাস্তবের রঙে রাঙিয়ে নিয়ে ধরেছেন। যেখানে জীবনপ্রবাহ নদীর স্রোতের না-বলা কথার সঙ্গে মিশেও জানান দিয়ে যায় জীবনে দ্বন্দ্ব আছে, সুখ-দুঃখ আছে, রিপুর তাড়না আছে, ভালবাসা-ভাল লাগা আছে। নিছক গল্প বলার জন্য তিনি গল্প বলেন না। তাঁর প্রতিটি কথনের মধ্যে আছে সময়কে প্রতিফলিত করার প্রয়াস। প্রয়াস আছে জীবনের আলো-আঁধারিকে ধরার। সর্বোপরি তাঁর কথনে আছে জীবন দর্শন। সময়ের পীড়নের যথার্থ উন্মোচন। জীবনকে ভাল না বাসলে, জীবনকে সম্যকভাবে উপলব্ধিতে না নিয়ে এলে এই অন্য ধারার কথন হয় না। কথনের ধরনটিও বেশ সুখপাঠ্য।

পীযূষ ভট্টাচার্যকে বুঝতে হলে, তাঁর কথনকে বুঝতে হলে, তাঁর কথনের দর্শনকে বুঝতে হলে ২০০৪ সালে প্রকাশিত 'নির্বাচিত গল্প'-কে (নির্বাচিত গল্প–পীযূষ ভট্টাচার্য, দীপ প্রকাশন, কলকাতা–৭০০০০৬) অবশ্যই পাঠ করতে হবে। এই সংকলনে মোট ২০টি গল্প আছে। গল্পগুলি হল–জঠর, ভাসান, মাছ, কুশপুত্তলিকা, ক্ষরণ, গারসি সংক্রান্তির কাক, দণ্ডকলসের ফুল, পচন প্রক্রিয়া, দহ, জ্যোস্নালোকে হুইলচেয়ার, ছোঁয়া বড়শি, কীর্তিমুখ, কোরবাণী, সীমান্ত শেষের যাত্রী, চক্ষুদান, স্বর্ণময়ী, মধুবনী, বোধনপর্ব, টুটু এখন হালুম বলছে এবং পটগাথা। গল্পগুলি ১৯৮৬ সাল থেকে ২০০৩-এর মধ্যে লেখা। এগুলি যেহেতু

তাঁর নির্বাচিত গল্প সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে সবই তাঁর প্রতিনিধিত্বমূলক লেখা। এরকমই একটি প্রতিনিধিত্বমূলক গল্প 'কীর্তিমুখ'-এর একটু অন্তর্তদন্ত করা যাক। গল্পটি শুরু হচ্ছে এভাবে–

> বৃষ্টি নামার পূর্ব মুহূর্তের চাপা স্নিগ্ধতায় টইটম্বুর চতুর্দিক। মেঘলা আকাশ জল–জল ভর্তি চৌবাচ্চায় একপ্রস্থ জলীয় বাতাসে ঢেউ খেলবার প্রয়াসের ভেতর মাছগুলি বুঝে নিতে চাইছে জমাট মেঘের অন্ধকার কতদূর? কিন্তু এতসব কিছুই তো জমিয়ে বৃষ্টি শুরু হওয়ার ইঙ্গিত। বৃষ্টি পড়তে শুরু করলে অনেক কাজ শান্তনুর–চৌবাচ্চায় নেট বিছানো, চৌবাচ্চায় নিচের কল খুলে কিছু জল বের করে দেওয়া যাতে বৃষ্টির জল ধরে রাখা যায় চৌবাচ্চায়। এসব ভাবতে ভাবতে রহস্যঘন পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে সে আবার বিষণ্ন হয়ে যায়।
>
> গীতিকে ওরাই পাঠিয়েছিল, না নিজেই এসেছে? গীতির অবশ্য এতক্ষণে বাসস্টপে পৌঁছে যাওয়ার কথা টানা দু' মাইল হাঁটবার পর। গীতি কি বাড়ি পৌঁছে টিভি খুলে জেনে নেবে বাতাসে কত শতাংশ আর্দ্রতা আজকে? বৃষ্টির ঘনঘটা কতদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হবে? গীতি কিন্তু এমনভাবে এসেছিল যেন কোনও মীমাংসার তাড়না ছিল। প্রায় আট-ন' বছর ধরে তৈরি হওয়া প্রশ্ন যে কীভাবে উপস্থাপনা করতে হয় তার রীতিনীতি না জানার জন্যই যেন করা হল না প্রশ্ন। কিন্তু শান্তনু এ মুহূর্তে বুঝে উঠতে পারছে না, মানুষের প্রত্যাবর্তনের কোনও কি নির্দিষ্ট দিশা আছে? কিন্তু যে ব্যক্তি উঠোনের সূর্যের নিচে দাঁড়িয়ে তাকে ঘরে ঢুকতে বলার গার্হস্থতা হারিয়ে গীতি এতটাই নিশ্চল ছিল যে শান্তনুকে বলতে হল–'ছাড়া পেয়ে চলে এলাম।'

ব্যক্তি জীবনে হয়ত এমনটাই ঘটে। দলবদ্ধ রাজনীতিতে শান্তনুকে হয়ত বড় করা হয়েছিল। সে কারণেই হয়ত হারু ঘোষকে হত্যার অপরাধে শান্তনুর দশ বছর জেল হয়। পরে জেল খেটে শান্তনুর বাড়ি ফিরে আসা। ইতিমধ্যে শান্তনুর স্ত্রী গীতির জীবনে শান্তনুর অনুপস্থিতিতে ঘটে যায় অন্য রকমের পরিবর্তন। দলনেতা নকুলদার গীতির জীবনে ঢুকে পড়া। গীতিকে চাকরি পাইয়ে দেওয়া। তাঁর বাসস্থানের পাশেই তৈরি হওয়া একটি ঘর হয়ত নকুলদাদের রিরংসা মেটানোর নিরাপদ আশ্রয়স্থল। সেটি পরিষ্কার হয়ে যায় শান্তনু ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরেই নকুলদার শান্তনুর বাড়িতে চলে আসা এবং শান্তনুকে অন্যত্র চলে যাওয়ার পরামর্শ দানে। ঘটনা পরম্পরা এভাবেই এগোয়–

> "কোনো রকম ভণিতা না করেই সরাসরি জিজ্ঞেস করে–'তুই কি এখন এখানে থাকবি?'

শান্তনু ভাবতে শুরু করেছিল নিজেকেই প্রশ্ন তুলে, কেন? কেন সে এখানে থাকবে না? বারবার তার মুখটা বিকৃত হতে হতে মনে হল সে ভয়ঙ্কর কিছু চিবচ্ছে। –'তুই হয়ত জানিস না হারু ঘোষের ছেলে সত্য একজন নির্দল জেলা পরিষদে। পরিষদে আমরা চারে চার–ওর ভোটেই পাওয়ারে–"

পাওয়ার ইকোয়েশনে কালকের শত্রু আজকের মিত্র। এ আর আশ্চর্য কি? আশ্চর্যের হল আমজনতা যাদের রাজনীতির খেলায় বোড়ে করে ব্যবহার করা তাদের ব্যক্তি জীবনকেও কলুষিত করে তোলা। ব্যক্তি জীবনের অন্দরমহলেও অনুপ্রবেশ ঘটানো। সেখানে স্ত্রী-সন্তান-সন্ততিকেও হাইজ্যাক করে নেওয়া? স্ত্রীকে বিসর্জন দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু আট-ন' বছর সময়ের ব্যবধানে কত কিছুই তো ঘটে যায়! তাও না হয় মেনে নেওয়া গেল কিন্তু শান্তনু-গীতির কীর্তিমুখ ঝুলনকে শান্তনু বিসর্জন দেবে কীভাবে? বিসর্জন অর্থে তাকে ত্যাগ করে শান্তনু থাকবে কীভাবে? কারণ কোনও মানুষই তার সৃষ্টিকে ভুলতে পারে না। দল, দলতন্ত্র মানে কি কীর্তিমুখকে অস্বীকার করা? যে জাদুবাস্তবতা দিয়ে গল্পটি শুরু হয়েছিল শেষও হচ্ছে একইভাবে।

"প্রবল বর্ষণে মাছ চাষের চৌবাচ্চা দুটি ভর্তি হয়ে গেলে মৃত মাছটি বাড়তি জলের স্রোতে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে বারবার আটকে যাচ্ছে কিন্তু তাকে অতিক্রম করে চৌবাচ্চার সমস্ত মাছই স্রোতের টানে বাইরে উঠোনে। এরকম আয়োজনের মধ্যে গীতি ও শান্তনু একইসঙ্গে একসময় বলে ওঠে–'ঝুলনটা একা একা কী করছে কে জানে–"

যৌন জীবনের ক্রিয়াকলাপেও কীর্তিমুখ যে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকে লেখক পুনরায় তা পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিলেন। এ এক অসাধারণ অভিব্যক্তি, এবং এইখানেই লেখকের কথনের মুন্সিয়ানা।

অনবদ্য দ্যোতনায় 'কোরবাণী' গল্পটিকে লেখক তুলে ধরেছেন। বাচ্চুমিয়া-কুলসুমের অসুস্থ সন্তানকে ঘিরেই এই গল্পের কথন। অসুস্থ কামালকে বাঁচিয়ে তোলার মরিয়া প্রচেষ্টা। তুকতাক-এ বিশ্বাসী হয়ে উট পর্যন্ত কোরবাণী দিতেও বাচ্চুমিয়া প্রস্তুত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় উটের পরিবর্তে তাঁর ছেলেরই কোরবাণী হয়। লেখক এই গল্পটি শেষ করেছেন এভাবে–

"পার্থিব জীবন শেষে আবার যখন অনন্ত সময়ের কোন বাঁকে পুনরুত্থান ঘটবে তখন কোরবাণীর উট ওদের তিনজনকে, কামাল-বাচ্চুমিয়া-কুলসুমকে প্রলয়ের নদী পার করে দেবে। কিন্তু যার আরোগ্যের জন্য এই কোরবাণী সেই যখন নেই তখন আর কেউ জানতে চায়নি পবিত্র কোরবাণীর উটের

সায় আছে কিনা? কামালের আততায়ী কে? এ প্রশ্ন করতে একসময় যখন সকলে ভুলে গেল তখন হাসপাতালে বাচ্চুমিয়া প্রথম কথা বলল–'মিনহা খালাক নাকুম অর্থাৎ তোমাকে এই মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে', 'আফিয়া নুয়িদোকুম–... এই মাটিতেই লীন হয়ে যেতে হবে।'

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাচ্চুমিয়া বাড়ি ফিরে দেখে স্থলভূমিতে মরুভূমির উট ভীষণ স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করছে।"

এর চেয়ে বাস্তব কথন আর কিই বা হতে পারে? জীবন-মৃত্যুর এরকম চূড়ান্ত দর্শনতত্ত্ব তুলে ধরা লেখকের পরিণত বক্তব্যের মুন্সিয়ানাকেই প্রতিফলিত করে।

এই সংকলনে আরেকটি অসাধারণ গল্প হল 'টুটু এখন হালুম বলছে'। গল্পটির শুরুটাও অসাধারণ। কথনের ভঙ্গিটা একটু দেখে নেওয়া যাক–

"মুখ-চোখ ইত্যাদি কিছুই দেখা যাচ্ছে না, অথচ খুউব কাছে থেকেই তো দেখছে তাকে এবং বুঝে উঠতে পারে না বড় একটা আয়নার সামনে একাকী নারী কী এমন দেখছে? সে কি তার নিজস্ব মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব দেখতে পারছে কোনোরকম চোখের সাহায্য ছাড়াই! মুখ-চোখহীন এই নারীর তো কথা বলবার শক্তি নেই এই মুহূর্তে–থাকলে কী বলত–কী এমন দেখবার আছে। যদিও বুক বরাবর সায়াটা বাঁধা, এটুকু খুলে ফেললে কিছু কি ক্ষতি হত? কেননা শরীরই সব, সর্বত্র এর ব্যাপ্তি, এই শরীরের মধ্যে আত্মসমীক্ষার অবকাশ বোধ হয় নেই। সময় কি পরখ করে নিচ্ছে সন্ধ্যা সজ্জার সময়কালে নিভৃত শরীর, সময়ের কাছে স্থূলকায় এই শরীর কীভাবে আরও আকর্ষণীয় হতে পারে। ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে যে রোদ এখন তার পায়ে খেলা করছে তা যেন এক মৃত্যুরেখা, তাই খুউব পরিচিত ঘর অপরিচিত হয়ে যাচ্ছিল নিখিলেশের কাছে। তই এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে বলে–টুটুকে তৈরি করে দাও।

একতাল কাদার মতন ঘুমন্ত ছেলেটাকে দেখে নিয়ে চলে গেছে নিখিলেশ।"

এক বারবণিতার বংশধরদের তত্ত্বতালাশে এসে নিখিলেশের মানবিক দিক এমন চমৎকারভাবে লেখক তুলে ধরেছেন তা যে কোন সংবেদনশীল মানুষের মনে রেখাপাত করে। রেখাপাত করে বারবণিতা বেলা নিজের সন্তান টুটুকে মানুষ করে তুলতে জীবন সংগ্রামে লড়তে লড়তে কীভাবে শেষ হয়ে যায়! আমাদের এই ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থায় বেলার মতো এরকম অসংখ্য মানবীর বদবাবুদের মনোরঞ্জনে জীবনকে বাজি রেখে

তিল তিল করে নিঃশেষ হওয়া আমরা কি আটকাতে পারি? এ তো সমাজের লজ্জা! এ তো আমার আপনার লজ্জা! এ তো সমাজপতিদের লজ্জা! আর আমাদের এই পাপের বোঝা বইতে হয় অজ্ঞাতকুলশীল বেলাদের, বেলার সন্তান-সন্ততিদের! হয়ত পীযূষবাবুর পক্ষেই সম্ভব আমাদের বৌদ্ধিক জগতে কিছুটা তোলপাড় করাতে এমন রূঢ় বাস্তবতা তুলে ধরা। এই কথন সত্যিই এক অসম্ভব উচ্চতায় পৌঁছায়।

এভাবেই একের পর এক বাস্তব জীবনের ঘটনা পরম্পরা দিয়ে লেখক তাঁর নিজস্ব কথন রীতি মূল্যবোধের আধারে তুলে ধরে সাজিয়ে দেন। কোনও সাধারণ ঘটনা এভাবেই অসাধারণ হয়ে ওঠে তাঁর নিজস্ব শৈলীর গুণে। পীযূষবাবুদের মতো লেখক কালে কালে তৈরি হন বলেই সিরিয়াস পাঠক সুদূর বালুরঘাটেও তাঁকে আবিষ্কার করেন। এই মননশীল লেখকের কাছে আমাদের চাওয়া-পাওয়ার শেষ নেই। তিনি আমাদের মনোরঞ্জনের জন্য নয়, উৎসন্নে যাওয়া সময়ের না বলা কথা আগামী দিনেও তাঁর নিজস্ব গদ্যশৈলী অটুট রেখেই আমাদের কাছে তুলে ধরবেন এই আশা ও আস্থা রাখি। লেখক তো বেঁচে থাকেন তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই। পীযূষবাবু এ পর্যন্ত যা সৃষ্টি করেছেন তা পাঠক সমাজে সমাদৃত হবে কালজয়ী হয়েই। তাঁর কাছে তাই আমাদের দাবি আকাশচুম্বী। তাঁর শারীরিক কুশল কামনা করি। তিনি সুস্থ থেকে আমাদের মতো অর্বাচীন পাঠকদেরও বোধ এবং বোধিতে দীর্ঘ দীর্ঘদিন ধরে কুঠারাঘাত করে চলুন এই আশাই করি।■

মুক্তির ভঙ্গিমা ও পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্প

তাপস রায়

কাফকার লেখায় বাস্তব ঘটনার চেয়ে তার প্রতিক্রিয়া বেশি প্রাধান্য পেত। ফ্রানজ কাফকাকে সম্ভবত সে কারণেই আধুনিক সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক লেখক হিসেবে মান্য করা হয়। তার সমস্ত রচনাই বাস্তব-পরাবাস্তবের মাঝামাঝি কোনও এক সূক্ষ্মতর বাস্তবের জগৎ জোড়া বিন্যাস। কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেই, জীবনের নানা উৎকণ্ঠা ও তা থেকে মুক্ত হবার একটা প্রয়াসেই ছেয়ে আছে তাঁর রচনা জগৎ। তাঁর লেখায় ইহুদিদের সংকট আছে কিন্তু ইহুদি নেই। তাঁর 'দ্য ট্রায়াল'-এর নায়ক জোসেফ, কী তার অপরাধ জানত না, কিন্তু বিচারে মৃত্যু হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে মানব সত্তার সামাজিক নিরাপত্তার অভাবই এবং এক সন্দিহান আবহ তাঁর সমগ্র সাহিত্য কর্ম জুড়ে উপস্থিত। আলব্যের কামু বলেছিলেন, কাফকা নাকি তাঁর পাঠককে দিয়ে পড়িয়ে নেন। বাংলা ভাষার গল্প পাঠ প্রসঙ্গে কাফকা এভাবে পুনরায় আন্তরিক হল। এই গল্পে ধনেশ পাখি নামে এক অলীক আত্মবীক্ষণ ego নিয়ে উপস্থিত vision তার রাজনীতি-টাজনীতি সহ রতিক্রিয়া সহ হেরে যাওয়া মানুষকে আরও হারানোর তলানিতে নিয়ে যেতে বিচারালয়ে টেনে নিয়ে যায়। বিচার শেষ হয় না, নায়কের আত্মার মৃত্যু ঘটিয়ে ব্রথেলের জেগে ওঠায় পুঁজির আস্ফালনে ক্রমশ শূন্য ঝুলে পড়ে, এ-ও অশেষ। কাহিনী বিন্যাসে লেখক প্রহসনমূলক যে প্রক্রিয়া আশ্রয় করেছেন, চিন্তার অনুষঙ্গে যেভাবে সত্যের অন্য মূর্তি উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন তাতে জোরালভাবে কাফকা নির্দেশিত দুঃসহ এক জগতের খোঁজ-খবর উঠে আসে। এই গল্পটির নাম 'পদযাত্রায় একজন'। গল্পের বইটিরও এই নাম। এটি গ্রন্থের প্রথম গল্প। ফলে মনে করা যেতে পারে লেখক পীযূষ ভট্টাচার্যের ফোকাস এই গল্পটিতে অনিবার্যভাবে বেশি। এই গল্পটিই তাঁর রাজনীতি চেনাবে। তাঁর মনস্তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, সময়ের যন্ত্রণাকে উন্মিলিত করার সৎ অঙ্গীকার। অর্থাৎ 'আপনাতে আপনি বিকশি'। এবং এই আপ্তবাক্যটি সম্ভবত এখানেও মান্যতা পাবে যে লেখক তাঁর সারা জীবনে একটি গল্পকেই বয়ন করেন। না হলে এ গ্রন্থের শেষ গল্পেও সমগ্র আবহ জুড়ে ভয়ের এক বৃহৎ শূন্যতা কেন টাঙিয়ে রাখা হবে। হেরে যাওয়া মানুষের অসহায়তা স্থাপিত করতে গিয়ে লেখক কোথাও

সোচ্চার নন, প্রতিবাদী নন। তাঁর রাজনীতি হল বহমান জীবনকে পাঠকের সামনে রেখে যাওয়া আর তা থেকেই উৎসারিত মানুষের নিজস্ব অস্তিত্বের খোঁজ। এর উপস্থাপন রীতিতে উদ্ভটতা বা অ্যাবসার্ড সাহিত্যের ফ্যানটাসি ও কৌতুকের প্রয়োগ যেমন আছে, আছে stream of conciousness-এর আবহও। 'পদযাত্রায় একজন' গল্পের ভেতর লেখক গল্প থেকে গল্পান্তরের অছিলায় এই মনপ্রবাহটিকে সামনে রাখেন। 'আদালত চত্বরে পৌঁছেই শুনেছি–কমলার আজ ফাঁসি হয়ে যাবে নির্ঘাত।' কে কমলা? প্রশ্ন করতে হয়নি। কোর্টের ঝোপঝাড় আদতে যা মুহুরির সেরেস্তা তা থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর গুঞ্জন ইত্যাদিকে জোড়া লাগালেই হয়ে উঠছিল একটা কাহিনী–কমলা তার পুরুষত্বহীন স্বামীর যৌনচিহ্ন হাঁসুয়ার এক কোপে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে মুক্তি খুঁজেছিল। কিন্তু যে-কোনও চিহ্নের উপস্থিতি এতই সোচ্চার যে মনে হল চিহ্ন আবিষ্কার থেকে বিলুপ্তি যদি কখনও ঘটানো যায় তথাপি কেন চিহ্নের উপস্থিতি থেকে যায়, অদৃশ্য এক চিহ্ন দিক নিদর্শন করে, চোখ রাঙায় সেখানে কে তোমাকে মুক্তি দেবে! যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানেও রয়েছে জীবকণিকার চিহ্ন–কেননা পায়ের নিচে মাটি তাতে ঘাস, ঘাসে আছে জীবনকণিকা, সেই ঘাস খেয়ে চলেছে গ্রাম থেকে আসা টাঙার ঘোড়াগুলো যাদের শরীরে আর এক জাতের জীবকণিকা–কিছু দূরে নদী, বা জলছবির মতন হাতের তালুতে বন্দি, সেখানে মাছরাঙ্গা আকারে জীবকণিকা ছোঁ মেরে জল থেকে ধরে নিচ্ছে মৎস্যাকৃতির জীবকণিকাকে। কমলার শরীরে কি এমন জীবকণিকা বহে চলেছে? তাকে বিচার করতে চলেছে যে হাকিম তার শরীরের জীবকণিকা খুবই কি পৃথক? না, পৃথকীকরণ এমনই রহস্যময় এই অমোঘ চিহ্নরেখা মুছে দেবে কে?

এইভাবে নিয়ন্ত্রিত ভালবাসার গল্পে লেখক অস্তিত্বকে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের অবিচ্ছিন্ন আর্কিটাইপ করে দিগন্তের মৃতদেহের সাথে রেখে দেন। মানবিকতার শর্ত মূল গল্পের ভঙ্গিমা পেরিয়ে জেগে ওঠে। বলা ভাল এ গ্রন্থের ১২টি গল্পেই লেখক নানা কোণ থেকে আজকের সময়ে যে মানবিকতা খুঁজে পাওয়া অ্যাবসার্ড হয়ে উঠেছে তাকে দেখতে যান। এই খোঁজপর্বে হয়ত একটা হেঁয়ালির বাতাবরণ আছে, কিন্তু জানালার পর জানালা খুলে বা গল্পের পর গল্পের ভেতরে সমাজের ভেতরের অসমাজ, মানুষের ভেতরের অমানুষ, ধর্মের ভেতরের অধর্ম লক্ষ্য করতে থাকেন। আর পাশে পাশে বহমান নদীটির মতো একটা ভয় চলতে থাকে। 'স্বপ্নের বাস্তবতা' গল্পে কাহিনীর চেনা ছক নেই, একটি নিরুদ্ধ আবেগ থেকে, চাপা ক্ষোভ-অভিমান থেকে ধর্মীয় জগতের বাস্তবতা নির্ণীত হয়। 'তুই কিন্তু ঝেড়ে কাশছিস না, সুহাসকে স্বপ্নে দেখেছিস কিনা?' 'যদি বলি দেখেছি, পারবি শালা চোখ দুটো উপড়ে ফেলতে? পারবি না। পারবি না জিবটা টেনে ছিঁড়ে ফেলতে?' 'জিবটা জিবটা' বলে যতখানি সম্ভব জিবটাকে সামনে বার করে দেওয়া যায় দেয়। অনেকটা সিংহবাহিনীর শুকনো জিবের মতন। প্রতি স্টেপে একটি করে হাড়িকাঠ, নদী থেকে কত স্টেপ এই মন্দির? প্রতি স্টেপেই নরবলি। সিংহবাহিনী বজরা থেকে উঠে আসছেন–রক্তরাগের পর্ব থেকে পর্বান্তরে পৌঁছেও দেবীর জিভ এত শুকনো কেন? কত রক্তপাতে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া যায়?

লেখক তার গল্প পরিবেশনে একটা রাজনীতি করেন। তিনি বুঝতে দেন না তিনি গল্পে

আউটসাইডার না অন্তর্গত। ফলে মেটামরফসিস। তাঁর প্রায় সব গল্পেই নারী-পুরুষ ও তাদের ভালবাসার, ভাল না বাসার অহরহ উপস্থিতি থাকে। কিন্তু সেটা গল্পের আড়াল। 'চোরাকুঠিতে একা এবং কয়েকজন' গল্পে কে মিনু? সুকমলের ডায়েরির পাতায় এত অন্ধকার কেন? এই জিজ্ঞাসা হয়ত লেখকেরও। বৈদিক যুগের ঘোড়ারূপ বজ্র শিল্পীর আয়ুধ কিনা তাও সম্পর্কহীন জগতে লেখক ভাসিয়ে দেন। লেখকের কাছে ঘটনার কোনও চাপ নেই, আছে প্রকাশের চাপ। লেখকের কাছে চরিত্র পরিচিত কি অপরিচিত–তা যায় আসে না। ঘটনা তাঁর কাছে বড় নয়, সিকোয়েন্স বড় নয়। সংলাপের ধারণ ক্ষমতার কোনও মানে নেই। অবয়বহীন একটা ধারণাই সুরের মতো করে চলতে ফিরতে থাকে। আত্মাকে চিত্রিত করার জন্যই যেন ঘটনা যা চরিত্রকে কখনও প্রাণবান করেন না, পলে পলে শুধু লক্ষণ বা চিহ্নের সামনে আসা। 'পশু' গল্পে এই চিহ্নের বেদনা তৃপ্তি পায়। পিছনের ডালার ওপর টর্চ জ্বালতেই প্রতিটি পশুর চোখ ধক্ করে জ্বলে ওঠে। ট্রাকের একতলা-দোতলা জুড়ে পশুর নির্বাক চাহনি অথচ প্রতিটি চোখই জ্বলছে। অলৌকিক বলেই সহ্য করা যায় না এ চাহনি। অলৌকিকের ইয়ত্তাও হয় না। ঘষটানি খেয়ে খেয়ে চাঁদ নিকেশ হয়ে এসেছে। ফিকে ফ্যাকাশে কোনও কথা নেই। সে ট্রাকের ডালায় দাঁড়িয়েই, শুধু বাংলা-বিহার মুলুকের চেকপোস্টের গুমটি উতরিয়ে বাতাস শিরশিরে বয়ে যাচ্ছে।

দাঙ্গার বাস্তবতাকে অবলম্বন করে লেখক চরিত্রগুলিকে ঘুলিয়ে দেন। 'সবুজ টিয়ার সাথে কিছুক্ষণ' গল্পে খাঁচার টিয়া পাখির সাথে মুক্তির প্রস্তাবনা নিয়ে একাকিত্বের আবিষ্কারে যান। এই চেনা জগৎ যেহেতু তাঁর নয়, ফলে সেই নতুনের জন্য তাঁর মুখে কোনও ভাষাও নেই। ভাষা চাই, তার প্রসারিত রূপ চাই। কে শেখাবে! বাবা! কে বাবা? অস্বস্তিকর অসঙ্গতি বয়ন করতে করতে লেখক আত্মগোপন করেন। তখন ভয় আর শীতের চেরা জিভ।

'মালতীর প্রকারভেদ' সত্তা ও শূন্যতার গল্প। যেহেতু মানুষের স্বাধীনতার মাত্রা মোচনই লেখক পীযূষ ভট্টাচার্যর অবস্থানভূমি, এ গল্পেও লেখক সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবেশের নিশ্চলতাকে প্রশ্ন করে চেতনার শূন্যতাকে আবাহন করেছেন। নারী ও শরীর শুধু গল্পের ডৌল। যেখানে বিনা কসরতে সমাজ, রাজনীতি, রাজত্ব ফাঁকা রাস্তায় গড়িয়ে যায়। আর সাধারণ মানুষের নিজস্ব নির্বাচনে বেবুশ্যে ধলি মালতী সতী-সাবিত্রী লেংড়ি মালতীর 'সই' পদপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ায়। আর সেই খোঁজ, যার জন্য লেখকের এই দায় তা পড়ে থাকে ছিন্ন পাতার মতো। 'অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তরের জন্য সামনের দিকে তাকায় অমূল্য। এই নির্জন শূন্যতা–স্রোতহীন নদীর বুকে কুয়াশার আগ্রাসন–ব্রিটিশ আমলের পুরোনো বাড়িটার ভেতর পরিত্যক্ত সাপের খোলসও হাওয়ায় সচল হয়ে যে-কোনো সময়ে ফণা তুলতে চায়।'

'মধুবনী' গল্পের শুরু হয় সমাজের দীর্ঘকালীন ইতিহাসবোধ ও সমাজবোধকে প্রশ্ন করে। আমাদের দেখা বাস্তবের মধ্যে অনেক ভ্রমের বাস। সেই বাস্তবকে পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখানোও ফলে ভ্রমাত্মক হতে বাধ্য। এজন্যই একজন লেখক বাস্তবতার পুনর্নির্মাণ করেন সমাজ মনের গভীরে ধারণায় আলো দিয়ে। সেই প্রকাশে যেহেতু চেতন নিশ্চেতনের জড়াজড়ি, রহস্যময়তা ছড়িয়ে থাকে চারপাশে। প্রশ্ন আর অন্তর্দহন ঘুরে ফিরে আসে। ভয়

আর অস্থিরতা তাৎপর্য পায়। 'ন্যসিয়া'-তে সার্ত্র নায়ক আঁতোয়ান-কে দিয়ে ব্যক্তির আতঙ্কবোধকে সামনে এনেছেন। তাঁর কাছে জগৎ ছিল অর্থহীন। তাঁর নায়ক এক বিচ্ছিন্ন মানসিকতায় আচ্ছন্ন ছিল। পীযূষ ভট্টাচার্য প্রশ্নে প্রশ্নে দীর্ণ হতে হতে নতুন জগতের আশ্রয় খোঁজেন নৈরাশ্য ও দুঃখের হাত থেকে বাঁচতে। 'মধুবনী' গল্পে তাঁর নির্লিপ্তির ভাষা জেগে ওঠে। 'রাত্রির গভীরতায় পৌঁছে গেলে ঘুমের ভিতর অর্ণবের হাতের উল্কির জলাশয় উপচে উঠে চতুর্দিক ডুবিয়ে দেয়। সে হয়ে ওঠে বিন্দুর মতন–এক। তাকে ঘিরেই ফুটে উঠেছে জলজ ফুল, উচ্ছ্বাসে মাছ ছুটে যাচ্ছে, ভীষণ চঞ্চল চার পায়ে কচ্ছপের চলন, জল বাড়তে বাড়তে একসময় তাকে ডুবিয়ে দেয়। নির্ভার শরীরে সে ডুবছে যেন পাতালে জলের তলদেশে কোনো আঘাত না পায় শরীর।'

সমগ্রের ধারণায় একথা বলা যেতে পারে লেখক পীযূষ ভট্টাচার্য প্রথাগত কাহিনীর কাঠামো থেকে সরে নানা পলে বীক্ষণ ও স্পর্শের স্বতঃশ্চল নিজস্ব মনোভূমির সান্নিধ্য দেন পাঠককে। মানুষের অস্তিত্ব খুঁজতে গিয়ে তিনি স্থানিক ফ্রেমটিকেও ফলে যত্নে দূরে রেখে একটি মহাজগতের ধ্যানে মগ্ন হন। ভাষার শিল্পসমেত ওই আত্মার মুক্তি চোখে দেখার রহস্যময় আলো বিভায় একজন পাঠকের যতটা অভিভূত হবার কথা এই প্রক্ষিপ্ত আলোচনায় ততটা ভরে উঠবার নয়।■

প্রতিবাদী লিটল ম্যাগাজিন

প্রতিস্রোত

সম্পাদক :সুজিত দাস

ই অ্যান্ড ডি কলোনি, তারাপুর, শিলচর, অসম

পীযূষ ভট্টচার্যের গল্প : কাব্যিক সম্মোহন

অরুণাংশু ভট্টাচার্য

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ছোট গল্পের শুরু এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা (১৮৪৮-১৯২২) 'মধুমতী' (১৮৭৩) প্রথম বাংলা ছোট গল্প–এ যদি ধরে নেওয়া যায়, তাহলে ছোট গল্পের বয়স নয়-নয় করেও ১৩৪ বছর পেরিয়ে গেছে। শতাধিক বছরের এই চর্চায় বাংলা ছোট গল্পে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও কম হয়নি। বিষয় থেকে বিষয়হীনতা, চরিত্র থেকে চেতনাপ্রবাহ, পারিবারিক-সামাজিক সমস্যা থেকে বিপ্লব কিংবা সম্পর্কের জটিলতা থেকে বিদেশি তত্ত্ব ইত্যাদি নানাবিধ প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ বিভিন্ন সময়ে বাংলা ছোট গল্পে এসেছে। এবং অদ্যাবধি সেসব সময়-অনুসারে ক্রিয়াশীল। তথাপি শতাধিক বর্ষব্যাপী এই বিস্তীর্ণ কালখণ্ডে বহুবারই অভিযোগ উঠেছে যে, বাংলা ছোট গল্প কম আকর্ষণীয় হয়ে পড়ছে বা তার নিজস্ব গতি হারাচ্ছে। এতাদৃশ অভিযোগ ইদানীংকালে বলতে গেলে আরও একটা রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে বিভূতিভূষণ-তারাশংকর-মানিক-জগদীশ-ধূর্জটিপ্রসাদ-জ্যোতিরিন্দ্র-দীপেন্দ্রনাথ-সমরেশ-রা বাংলা ছোট গল্পকে যে উচ্চতায় ও মর্যাদায় স্থাপন করে গিয়েছিলেন, এখন তা বহুলাংশেই নিম্নমুখী বা অবসৃত–এ মন্তব্যে অসম্ভব কোনও আপত্তি থাকার কথা নয়। এতে বর্তমান আলোচককে অনেকটা প্রাচীনপন্থী মনে হলেও জীবনচিন্তার যে গাঢ়তার সন্ধান উপরি-উক্ত লেখকরা দিয়েছিলেন, তার প্রেক্ষিতে যদি গত ৩৪/৪০ বছরের গল্পের তুলনা টানি, তাহলে দেখা যাবে মন্তব্যটি হয়ত একেবারে অমূলক নয়। তবে পরবর্তীকালের গল্পকারদের কোনও অবদান নেই, তাঁরা মননশীল নন, এ কথাও কোনও মতেই গ্রাহ্য নয়। গল্প নিয়ে বহুতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁরা করেছেন। বিমল কর, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে আজকের তরুণতম গল্প লেখক দেবকুমার বোস পর্যন্ত বাংলা ছোট গল্পের যে ধারা তাতে বহুরকম উপাদান এসে মিশেছে, জীবন ও পারিপার্শ্বকে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে দেখার চেষ্টা করেছেন। এই ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতের একটি দিক হচ্ছে গল্পে কাব্যিক সংকেত ও সম্মোহন। সত্য কথা বলতে কী, পুরনো দিনের গল্পে এই রীতিটির পরিচয় আমরা খুব বেশি পাইনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও বেশ অনেকটা পর থেকেই বাংলা ছোট গল্পে প্রধানত এই ধারাটি লক্ষ্য করা যায়। বলতে গেলে সেটা সত্তর দশকের কিছু পূর্ববর্তী সময় থেকে।

ইতিহাস বলছে বীজ অনেক আগে উপ্ত থাকলেও মূলত ষাটের দশক থেকেই গল্পে একটু বেশি মাত্রায় কাব্যিক সংকেত লক্ষ্য করা যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর পিছনে বিদেশি তত্ত্বের প্রভাব আছে। তাঁরা বিশেষভাবে কাম্যু-কাফকা-জয়েসেরই উদাহরণ দিতে প্রয়াসী হয়েছেন। সেটা যে খুব অমূলক তা নয়, কিন্তু তারও পরবর্তীকালের গল্প যদি আমরা পড়ি, তাহলে দেখব কাম্যু-কাফকা-জয়েসের প্রভাব সেখানে কিন্তু একেবারেই নেই। বরং তার বদলে মার্কেজ-বোর্হেস-এর ছায়াপাত বেশি। এটা সম্ভবও হয়। এবং তা থেকেও গল্পকাররা অচিরেই মুক্ত হতে চান, হয়ে যানও বোধ হয়। অপুষ্টি বা বদহজমের মতো উদাহরণ যে নেই, তা নয়। তবে পাঠক তাঁদের মনে রাখেন না বা রাখেননি–এমন তো স্বচক্ষেই দেখছি।

আমরা বলছিলাম গল্পে কাব্যিক সংকেত ও সম্মোহন-প্রসঙ্গ এবং বিদেশি প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়ার কথা। এটি অর্বাচীনকালের অবদান হলেও বিষয়টিকে প্রধানভাবে অবলম্বন করে যাঁরা গল্প লিখেছেন বা লিখতে চেয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়। পাঠক লক্ষ্য করবেন, আমরা এখানে 'প্রধানভাবে' নামক একটি শব্দের সন্নিবেশ ঘটিয়েছি। একজন গল্পকার নানারকমের গল্প লেখেন, তাঁর একটি গল্পে কিছুটা কাব্যিক সংকেত থাকতেই পারে কিন্তু এটাকে গল্পের প্রধান হিসেবে নির্বাচন করা–এ উদাহরণ একটু কমই। এই ধারারই এক অন্যতম গল্পকার পীযূষ ভট্টাচার্য।

সত্যি কথা এই যে, পীযূষের গল্প আমি ইতস্তত দু-একটি পত্রিকায় পড়েছি। তার সংখ্যাও খুব বেশি নয়। কিন্তু বইগুলি পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁর গল্পের বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে আমার পাঠ-অভিজ্ঞতায় পীযূষের গল্পের যে সাধারণ লক্ষণগুলির পরিচয় পেয়েছি তা লিপিবদ্ধ করি। জীবনচিন্তার গাঢ়তা, সংক্ষিপ্ত বিবৃতি-প্রবণতা, ব্যঞ্জনাকুশল বাকরীতি, জীবন-সমস্যার তির্যক প্রতিফলন ও কাব্যিক সংকেত-সম্মোহন।

উপরে যে লক্ষণগুলির কথা বলা হল, তা নিশ্চিতভাবে বাংলা ভাষার বহু গল্পকারের মধ্যে আছে। সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু পীযূষ এক কাব্যিক সম্মোহনের মধ্য দিয়ে গল্পের সমস্ত লক্ষণকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। এটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কিন্তু তাঁর গল্প পড়ে কখনও সেটিকে বিশুদ্ধ কবিতা বলা যাবে না। যায়ও না বোধ হয়। তবে গল্পের ডিটেলের মধ্যে পীযূষের সংকেত ও প্রতীক এমনভাবে খেলা করতে থাকে যে, তা গল্প হয়েও কবিতার মাত্রাকে স্পর্শ করে যায়। যেমনটা আমরা জীবনানন্দের গল্পের মধ্যে পাই। যেমন পীযূষের 'জীবিসঞ্চার' নামে একটি ছোট উপন্যাস আছে। তার অংশ বিশেষ এরকম–'বহু আলোকবর্ষ পেরিয়ে কোন নক্ষত্রের আলো পায়রার পাখনার ছায়া হয়ে পৃথিবীতে পড়বার কথা নয়। শূন্য চাতাল জুড়ে সমস্ত কিছুর স্বভাবহীনতার শূন্যতার মধ্যে বাতাস বয়ে চলেছে কেবল।' কিংবা 'দলছুট' গল্পে লক্ষ্য করি, 'ছায়ার সৃষ্টিই যেন সমস্ত উৎসকে রুদ্ধ করার জন্য। আসলে এই রোদ্দুরে ছায়া থাকবার কথা নয়; তথাপি বড় আমগাছটিতে উৎসারিত সূর্যালোক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ছায়া বিস্তারে রত। এই নিরালম্ব ছায়ার ভিতর ডুবে যেতে যেতে দেখি–জলাভূমির জলের ভিতর একটি সাপের চলনের রেখার দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ হয়ে যাওয়া। এ রেখার চলন সোজা-সরল নয়। জটিল। প্রতিটি বাঁকেই ছড়িয়ে যাচ্ছে

গুচ্ছের অন্ধকার। বিশাল এক জলাভূমির শূন্যতার ভিতর কেমন ভয় ভয় করে উঠল এবং শীত শীত।' পাঠক অনুধাবন করুন, এ কোনও কবির বর্ণনা নয়, কিন্তু কী কাব্যিক সম্মোহন এই ডিটেলিংয়ের পরতে পরতে। শুধু তাই নয়, পীযূষ যখন গল্পের পাত্র-পাত্রীর সংলাপ কিংবা ঘটনার বর্ণনা দেন তখনও তার মধ্যে পুরোমাত্রায় এই সাংকেতিকতা নিহিত থাকে। আসলে পীযূষ যা লেখেন তা কখনওই ঘটনাপ্রধান বা চরিত্রপ্রধান হয়ে ওঠে না। হয়ে ওঠে না অতি বর্ণনায় দীর্ঘ। জীবনচিন্তার যে গাঢ়তার কথা একটু আগে আমরা এই আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চেয়েছিলাম, তাকে পীযূষ নিজস্ব একটি ভাষা প্রদান করেন। মনে হতে পারে এই ভাষা বোধ হয় আয়াসসাধ্য, কিন্তু না, এটি পীযূষের সহজাত। যার ফলে সমস্ত গল্পের মধ্যে ওই সম্মোহন বিস্তারে তিনি সফল হন।

পীযূষের গল্পে একধরনের অস্বস্তি আছে। অস্বস্তি এই অর্থে যে, তাঁর উপন্যাস বলুন আর গল্পই বলুন, একবার পড়ে সে সবের মর্মোদ্ধার করা সত্যিই বেশ কঠিন। নিজের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, পীযূষের প্রতিটি লেখাই কম করে আমাকে তিন থেকে চারবার পড়তে হয়েছে। এ থেকে সাধারণভাবে বোঝা যায়, তিনি কখনও কোনও গোল গোল গল্প বা মিলনান্তক কোনও কাহিনী লিখতে চাননি। সেই অর্থে তাঁর গল্পকে যে প্রখর ট্র্যাজেডি বলব, তাও নয়। কালপ্রবাহে যে ঘটনা সমূহ আমাদের চারপাশে ঘটে চলেছে, চরিত্রগুলি সেখানে এক আলো-অন্ধকারের বিন্দু নিয়ে খেলা করে। ফলত কাব্যিক সাংকেতিকতার মতো কিছুটা আপাত অসংলগ্নতা এবং তার তির্যক প্রতিফলন আমরা তাঁর চরিত্র, ঘটনা এবং ভাষার মধ্যে লক্ষ্য করি। সুতরাং ওই অস্বস্তি পীযূষের ক্ষেত্রে এক অলংকারের মতো। যার ব্যঞ্জনায়, বলা যেতে পারে পরিমিত ব্যঞ্জনায় আমরা বহুলাংশেই সমৃদ্ধ।

পীযূষের গল্পের সময় নিয়ে কিছু বলার আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এমন বলতে চেয়েছিলেন যে, লিখে তা বেশ কিছুদিন ধরে ফেলে রাখলে তার দোষগুণ পরীক্ষিত হতে পারে। চটজলদি লেখা এবং তা প্রকাশ করার মধ্যে যে অবিবেচনা থাকে তা কোনও লেখকের কাছেই কাম্য নয়। কিন্তু আমরা কতজন আর তাঁর কথায় কর্ণপাত করেছি? ফলে আমাদের লেখায় যে ত্রুটি থাকে, প্রকাশ করলে সেসব সংশোধনের সুযোগই থাকে না। দ্বিতীয়ত অভিজ্ঞতাকে বেশ কিছুদিন ধরে জারিত হতে দেওয়াও মহৎ লেখার ধর্ম। আমরা তাও মেনে চলি না। আমাদের মহাকাব্যগুলি যে বা যাঁরা রচনা করেছিলেন, তাঁরাও ঘটনার বহুদিন পর সেগুলিকে সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। এই মহতী লক্ষণ আমরা লক্ষ্য করি পীযূষের লেখায়। তাঁর গল্পগুলির অধিকাংশ পড়ে আমাদের মনে হয়েছে, ঘটনাগুলি সত্তর দশকের উত্তাল দিন এবং তার কিছু পরবর্তী সময়ের কথা। এবং সেইসব অভিজ্ঞতা নিয়ে পীযূষ গল্প লিখেছেন কম করে ১৫/২০ বছর পরে। সত্তরের নকশাল রাজনীতি, হত্যা, আন্ডারগ্রাউন্ড পলিটিকস, কালোবাজারি বা আদর্শবাদের ছায়া যেমন পীযূষের গল্পে আছে, তেমনই আছে আদর্শচ্যুত হয়ে যাওয়ার ইতিবৃত্ত। সত্তর পরবর্তী অনিশ্চয়তা এবং বিপ্লবে যারা কোনও রকমে যুক্ত ছিল না, যারা গ্রামের নিরক্ষর, শান্তিপ্রিয় মানুষ, তারাও কীভাবে বিপ্লবের এক বিষময় ঘেরাটোপে কীভাবে পরোক্ষে বন্দি হয়ে গেল, তার স্পষ্ট আভাসও পীযূষের লেখায় আছে। সেই দিক দিয়ে তাঁর গল্পের চরিত্রগুলিকে কেমন যেন এক প্রতীকের মতো মনে হয়। এবং

সেজন্যই বোধ হয় একই নামের চরিত্র পীযূষের বহু গল্পের মধ্যে আছে। যেমন গীতি, বাচ্চুমিঞা, অন্ত, কামাল প্রভৃতি। এমনও হয়েছে একই চরিত্র নিয়ে তিনি গল্প এবং উপন্যাস দুই-ই লিখেছেন।

আসলে পীযূষ তাঁর গল্পের মধ্যে যে কবিতা রচনা করতে চান বা কবিতার সাংকেতিকতা ও অস্বস্তিকে আশ্রয় করে যে গল্প রচনা করেন, তা সম্পূর্ণত বাস্তব হয়েও অতিবাস্তবতায় আক্রান্ত বা উন্নীত। কোনও অগভীর সমস্যা নিয়ে পীযূষ কখনও গল্প লেখেননি। বক্তব্যটিকে ঘুরিয়ে এ ভাবেও বলা যায় যে, জীবনের কোনও ঘটনাকেই তিনি অগভীর বলে চিহ্নিত করতে চাননি। ফলত, তাঁর গল্প নিদ্রাকর্ষক বটিকা নয়। জীবনচিন্তার যে গাঢ়তা, জীবন ও ইতিহাস সম্পর্কে যে গভীর বিশ্বাসে তিনি স্থিত, তা তাঁর মধ্যে এক সভ্যতর বোধের জন্ম দেয়। যা গল্প হয়েও কবিতার সম্মোহনে ঘেরা, অভিজ্ঞতার ইতিহাস হয়েও সতত এক সংহত শিল্প। ফলত পীযূষের গল্প পড়ে আমরা যে শুধু সমৃদ্ধ হই, তা নয়, তা আমাদের প্রজন্মান্তরে ঋণী করে রাখে বইকি।■

কীর্তিমুখ

অভিজিৎ করগুপ্ত

পীযূষ ভট্টাচার্য 'কীর্তিমুখ' গল্পটি ঠিক কখন লিখেছিলেন আমরা জানি না। আসলে গত দশ বছর ধরেই পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতি জগতে এক ধরনের অস্থিরতা বারবার আমাদের ভাবিত করেছে। বলা বাহুল্য এই অস্থিরতার কারণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রের শূন্যতা। পরম যত্নে লালিত স্বপ্নের অপমৃত্যু বিষণ্ন করে তোলে শিল্পী মনকে। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় কখনও তির্যকভাবে কখনও বা উচ্চগ্রামে প্রকাশ পেয়েছে সেই বিষণ্নতা। এরই মাঝে কখনও কখনও বিভিন্ন প্রকাশ মাধ্যমেও থাবা বসিয়েছে সেই যন্ত্রণা। সাম্প্রতিক বাংলায় এর নিদর্শন নেহাৎ কম নয়। বেশ কিছু গল্পে, কবিতায় এমনকী নাটকেও তার প্রকাশ ঘটেছে। 'কীর্তিমুখ' এই মিছিলেরই শরিক।

একদা শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বে বিশ্বাসী পার্টি ক্রমশ শ্রেণী সহযোগিতার চোরাবালিতে আটকে গেছে, আর লক্ষ্য ও পথ কখন যে হারিয়ে গেছে ক্ষমতা, প্রশাসন এবং সর্বগ্রাসী সংগঠনের গোলকধাঁধায় তা বোধহয় পার্টি নিজেও জানে না। আজ আর বলতে কোনও দ্বিধা থাকার কথা নয় যে এই বিচ্যুতি, মতাদর্শের এই অবনমন দীর্ণ করেছে স্রষ্টাকে। যন্ত্রণায় বিক্ষত হতে হতেই উঠে এসেছে গল্প, কবিতা, অথবা নাটক। পীযূষ ভট্টাচার্যের মানস জগতেও যে একই রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে এই সময়, 'কীর্তিমুখ' গল্পটিই তার জ্বলন্ত উদাহরণ। জমি দখলের লড়াইয়ে পার্টি কর্মী শান্তনুর নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে নিহত হয় জোতদার হারু ঘোষ। আইনের চোখে শান্তনু খুনী। কিন্তু পার্টির চোখে? দশ বছর পার হয়ে আসার পর শান্তনুর কাছেও এ প্রশ্নের উত্তর অজানা থেকে যায়। জেলে থাকাকালীন বারবার সে স্ত্রী গীতি, সতীর্থ নকুড়কে প্রশ্ন করেছে–'এটা কি কোনও ব্যক্তি হত্যা?' শান্তনু জানত না এ প্রশ্নের কোনও নির্দিষ্ট উত্তর নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় উত্তর, যেমন বদলে যায় পার্টির চরিত্র, তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিচিত্র মানচিত্র। 'কীর্তিমুখ' এই বদলে যাওয়ারই ইতিবৃত্ত। গল্পের নামকরণের তাৎপর্যও অসাধারণ। যেভাবে পৌরাণিক অসুর কীর্তিমুখের সঙ্গে বর্তমান পার্টির তুলনা করা হয়েছে এক কথায় তা অনবদ্য।

পীযূষ ভট্টাচার্যের এই গল্পটিরই নাট্যরূপ দিয়েছেন তরুণ নাট্যকার শবর রায়। গল্প

থেকে নাট্যে রূপান্তরিত হলেও নামকরণে কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। আসলে পীযূষবাবুর এই গল্পটির ক্ষেত্রে এ হেন পরিবর্তন ঘটানো অসম্ভব। সঙ্গত কারণেই শবর ওপথে যাননি। নাতিদীর্ঘ গল্পটিকে শবর সাজিয়েছেন পাঁচটি ছোট দৃশ্যে। নাটকটি শুরু হয় কিছুটা ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতিতে–শান্তনুর নেপথ্য ভাষ্য দিয়ে। নাট্যকারের নির্দেশ অনুযায়ী আলোর স্থান পরিবর্তনে মূল ঘটনায় প্রবেশ করি আমরা। দীর্ঘ কারাবাসের পর শান্তনু ফিরে এসেছে স্ত্রী গীতি এবং কন্যা ঝুলনের কাছে। দ্বিতীয় দৃশ্যেরও বিন্যাস কৌশল প্রায় একই। প্রথমে শান্তনুর নেপথ্য ভাষ্য তারপর মূল দৃশ্যে যাওয়া। এখানেই আমরা পাই পুরনো পার্টি কমরেড নকুড়কে। আর এখানেই প্রথম উঁকি মারে নাটকের বিষয়গত দ্বন্দ্বের দিকটি। জেল থেকে শান্তনুর ছাড়া পাওয়ার ঘটনা পার্টির মধ্যে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তার আঁচ পায় শান্তনু। সে বুঝতে পারে মাঝখানে দশটা বছর পার হয়ে গেছে। বদলে গেছে সময়। বদলে গেছে তার পার্টিও। তৃতীয় দৃশ্যের বিন্যাস পদ্ধতিতেও কোনও বৈচিত্র্য নেই। আবার সেই নেপথ্য ভাষ্য তার পর মূল দৃশ্য। এখানেই আমরা পাই কীর্তিমুখের অনন্য রূপকল্প। গোটা বিষয়টাই এক ধাক্কায় ভিন্ন একটা ডাইমেনশন পেয়ে যায়। পাঠক হিসেবে আমাদেরও সচকিত হয়ে উঠতে বাধ্য হতে হয়। চতুর্থ দৃশ্যেও শবর একই বিন্যাস পদ্ধতি অর্থাৎ প্রথমে শান্তনুর ভাষ্য দিয়ে শুরু করে তার পর মূল দৃশ্যে প্রবেশ করেন। জেলা পরিষদের সভাধিপতির দপ্তরে পার্টি নেতৃত্বের সভা। বিচ্যুতির মানচিত্রটিও পরিষ্কার হয়ে যায়। শেষ দৃশ্যে কোনও নেপথ্য ভাষ্য নেই। আবার শান্তনুর ঘর। ফিরে এসেছে গীতি, কারণ একটাও বাস চলছে না। নির্বাসিত শান্তনু আর গীতি মুখোমুখি। গীতিকে আঁকড়ে ধরে শান্তনু সব কিছু ওলট পালট হয়ে যাবার কারণ বুঝতে চায়। মানসিক যন্ত্রণা ক্রমশ পথ খুঁজতে চায় শরীরী আকাঙ্ক্ষার দ্যোতনায়। হয়ত এও এক ধরনের বিচ্যুতি। এভাবেই হয়ত স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা তার ভাষা খুঁজে নিতে চায়।

'কীর্তিমুখ' গল্প এবং তার নাট্যরূপ দুটিই সুলিখিত। লেখকদের সংশ্লিষ্ট মাধ্যমের উপর দখল নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায়–বারবার কেন এভাবে শান্তনুদের মোহভঙ্গ হয়? কেন? কোথায় লুকিয়ে আছে এর উত্তর? পার্টি সংগঠনে? নেতৃত্বের ভ্রান্তিতে? নাকি মতাদর্শের কোনও এক আপাত অ-দৃশ্য গহ্বরে?■

কীর্তিমুখ

রচনা : পীযূষ ভট্টাচার্য

নাট্যরূপ : শবর রায়

প্রথম দৃশ্য

[হালকা সুরের একটি আবহ। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। ব্যাঙের ডাক। পর্দা উঠবে। মঞ্চের এক কোণে একটি চৌকি। তার ওপরে একজন লোক চাদর গায়ে জড়িয়ে উবু হয়ে বসে সিগারেট খাচ্ছে। লোকটির মাথা নিচু। আলো-আঁধারি পরিবেশ। ধীরে ধীরে লোকটি মাথা তুলে সামনে তাকাবে। সিগারেট খাবে। আবার মাথা নিচু। নেপথ্যে কথা ভেসে আসবে।]

নেপথ্য (শান্তনু) : আমি এখন কোনও জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা এক বজ্রাহত তালগাছ, যে, সমস্ত গাছেদের মধ্যে দাঁড়িয়েও আর গাছ নয়। বিকৃত এক অবয়ব মাত্র। দলছুট। একা। অথচ গাছটির শিকড় এখনও আঁকড়ে আছে মাটি। এখনও সে গভীরতার প্রত্যাশী। কিন্তু একথা কেউ বুঝতে চাইবে কি? জননী ও কন্যার নিরপরাধ পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইলেই কি ফেরা যায়? আর সত্যিই তো, এ কেমন ফিরে আসা? কোনও মিছিল নেই, উৎসব নেই, জয়ধ্বনি নেই। নিঃসঙ্গ, একাকী ফিরে আসা...। মানুষের প্রত্যাবর্তনের কোনও কি নির্দিষ্ট দিশা আছে?

[মঞ্চের অন্য পাশে আলো জ্বলে উঠবে। একটা গ্রিল দেওয়া বারান্দা। একটা খাঁচার আদল এসেছে। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। লোকটি চাদর খুলে চৌকিতে রেখে গ্রিলের দরজায় চলে যাবে। এবার কড়া নাড়বে লোকটি। গ্রিলের অন্য পাশে একজন মহিলা এসে দাঁড়ায়।]

গীতি : কে?

শান্তনু : আমি।
গীতি : কে? কে?
শান্তনু : আমি।
গীতি : তুমি! কোত্থেকে?

[তাড়াতাড়ি চাবি দিয়ে দরজাটা খোলে। শান্তনু ধীরে ধীরে ভেতরে ঢোকে।]

শান্তনু [হাসে] : ছেড়ে দিল। গুড কন্ডাক্টের জন্য দেড় বছর ছাড়।
গীতি : তুমি জানাতে পারতে!
শান্তনু : হ্যাঁ, মানে শেষপর্যন্ত ছাড়বে কিনা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ করে সব কিছু এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল যে...[পেছনে একটা বছর দশ-বারোর মেয়ে এসে দাঁড়ায়।] ঐ কি ঝুলন?
গীতি : অ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো, ঝুলন, এই তোর বাবা।

[ঝুলন একবার শান্তনু, একবার তার মায়ের দিকে তাকায়। আবার শান্তনুর দিকে। তারপর হঠাৎ পেট চেপে ধরে আঃ আঃ চিৎকার করতে থাকে। শান্তনু ও গীতি দু'জনেই হতচকিত হয়ে যায়।]

গীতি : কী হল? ঝুলন, কী হয়েছে?
ঝুলন : তলপেটটা। মা...আ...আ...

[গীতি তাড়াতাড়ি ওকে ধরে ভেতরে নিয়ে যায়। শান্তনু বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে স্থির। হতবুদ্ধি। হঠাৎ ভেতর থেকে ঝুলনের আঃ আঃ চিৎকার শোনা যায়। শান্তনু বারান্দা থেকে তাড়াতাড়ি ড্রইংরুমে ঢোকে।]

শান্তনু : কী হল গীতি? ঝুলনের কী হল?
গীতি : [ভেতর থেকে উত্তর দেয়] কিছু না...আ। তুমি বসো।

[শান্তনু ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসে। বসে ঘরটা দেখতে থাকে। সামনের টেবিলের ম্যাগাজিন হাতে তুলে নেয়। গীতি ঘরে ঢোকে। শান্তনু বইটা রেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়।]

শান্তনু : কী হল?
গীতি : ঐ মেয়েদের ব্যাপার। ঝুলনের এই প্রথমবার হল। তুমি বসো।
শান্তনু : ও কোথায়?

গীতি : শুইয়ে দিয়েছি। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছে।
শান্তনু : তুমি ওকে দ্যাখো।
গীতি : ঠিক আছে। সব মেয়েরই প্রথমবার এরকম হয়। কিন্তু কী আশ্চর্য! তুমি এলে আজ, আর ওরও...তোমাকে দেখে ও বড় হয়ে গেল।
শান্তনু : আমি যখন জেলে যাই, তখন ও বোধহয় এক বছরও নয়। তাই না?
গীতি : ন' মাস।
শান্তনু : আমার মেয়ের শৈশবটা আমার অদেখাই থেকে গেল। সত্যি কতগুলো বছর। মেয়েটা কি আমাকে মানতে পারবে ওর বাবা বলে?
গীতি : সময়ই সব ঠিক করে দেয়। এখন ওসব কথা থাক। তোমার জন্য কিছু খাবার বানাই। সেই বহরমপুর থেকে এতটা পথ। তোমার তো অভ্যাসও নেই।
শান্তনু : না গীতি এখন শুধু এক কাপ চা খাব। অন্য কিছু নয়। আমি খেয়ে এসেছি। [শান্তনু সিগারেট ধরায়। গীতি দ্যাখে।]
গীতি : ওখানে এসব পেতে?
শান্তনু : ঐ পুরোনো হওয়ার সুবাদে মিলে যেত আর কি। আসতে আসতে দেখছিলাম সব কত বদলে গেছে। কত নতুন নতুন দোকানপাট। বাস স্ট্যান্ড।
গীতি : বছর এগারো তো কম দিন নয়।
শান্তনু : জীতেশদার মেডিসিন সেন্টারটাও দেখলাম বেশ বড়, ঝাঁ চকচক হয়েছে।
গীতি : জীতেশদা মারা গেছেন। তার দুই ছেলে ব্যবসাটা দ্যাখে।
শান্তনু : জীতেশদা মারা গেছেন? [শান্তনু আর গীতি দু'জনেই চুপ করে বসে থাকে।]
গীতি : নাও ওঠো। হাতমুখ ধুয়ে নাও। আমি চা-টা বানাই।
শান্তনু : ঝুলনকে দেখব একটু।
গীতি : থাক এখন, ও বিশ্রাম করুক।
শান্তনু : হ্যাঁ, সেই ভাল।

[আলো নেভে।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[আবার সেই একই ভঙ্গিমায় চৌকির ওপর চাদর জড়িয়ে বসে আছে শান্তনু। একইরকম আলো-আঁধারি পরিবেশ।]

নেপথ্য : জীতেশদা ছিলেন আশ্রয়ের মতো। ওষুধের দোকান নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকলেও আমাদের কাজকর্মের খবর রাখতেন। গীতির সঙ্গে বিয়ের পর পর একদিনে

চারবার জীতেশদার দোকানে গিয়ে মাথাব্যথার ট্যাবলেট চাইলাম। শেষবার ধমকে উঠলেন, 'মাথা ধরার ট্যাবলেট। হতভাগা। নতুন বিয়ে করেছিস, কী দরকার বুঝি না।' সবার সামনে সে এক কাণ্ড। তারপর হাত চেপে ধরে বলেছিলেন, 'এত লজ্জা পেলে বিপ্লব করবি কী করে!' ঝুলন হওয়ার সময়ও বারবার খোঁজ নিতেন। স্যাম্পেল ফাইল ডেকে দিতেন– 'এটা বউমাকে ঠিকমতো খাওয়াবি।' কোর্টের রায়ের পর ভ্যানে তোলার সময় কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। জীতেশদা এগিয়ে এসেছিলেন–'চিন্তা করিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।' আমাদের কাজকর্মের মধ্যে কোথাও ছিলেন না জীতেশদা। তবু ভালমন্দের বিচারের একটা মানদণ্ডের মতো মনে হত তাকে। আশপাশ থেকে এই মানুষগুলো কীভাবে সরে গেল, ঝরে গেল। সেই শূন্যস্থান ভরাটই বা করছে কারা? তারা কেমন মানুষ? প্রশ্নগুলো মাথার মধ্যে ভিড় করে আসে।

[অন্য পাশে ড্রইংরুমের আলো জ্বলে ওঠে। একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বসা। পাজামা, পাঞ্জাবী, কাঁচাপাকা চুল। একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছেন। শান্তনু ঢোকে।]

শান্তনু : আরে নকুড়দা, কেমন আছ? কত দিন পর।

নকুড়দা : [উঠে দাঁড়িয়ে জড়িয়ে ধরে] হ্যাঁ, অনেক দিন পর। কোথায় গিয়েছিলি?

শান্তনু : এই সিগারেট কিনতে।

নকুড়দা : তা কেমন আছিস? শরীর টরির...

শান্তনু : একদম ঠিক আছি। কোনও প্রবলেম নেই। তা তুমি কোত্থেকে খবর পেলে?

নকুড়দা : আমরা জানতাম তোকে ছাড়ছে। তবে এত তাড়াতাড়ি হবে বুঝতে পারিনি। কাল রাতে সভাধিপতি আমাকে খবরটা দিল। তাই ভাবলাম সকাল সকালই দেখা করে আসি।

শান্তনু : কিন্তু তোমার চুল টুল পেকে কী অবস্থা। তুমি তো আমাদের লিডার। সেই তুমিও বুড়ো হয়ে গেলে?

[কথপোকথনের মধ্যে গীতি চা নিয়ে প্রবেশ করে। দু'জনকে চা দেয়।]

নকুড়দা : আরে বয়সটা কম হল নাকি। আর এখন সব ইয়ংরা এসে গেছে। তাদের সামনে এগিয়ে দেওয়ার পালা। আমরা তো পেছনে রইলামই। [চায়ে চুমুক দিয়ে] তা তুই কি ঠিক করেছিস?

শান্তনু : কিছুই ঠিক করিনি। সবে তো এলাম। পার্টি যেভাবে কাজ করতে বলবে করব। [চায়ে চুমুক দেয়।]

নকুড়দা : তুই কি এখন এখানেই থাকবি?

[শান্তনু অবাক হয়ে একবার নকুড়দা, একবার গীতির দিকে তাকায়।]

শান্তনু : এখানে ছাড়া কোথায় থাকব? কেন, কী প্রবলেম?

নকুড়দা : তুই হয়ত জানিস না হারু ঘোষের ছেলে সত্য, একজন নির্দল সদস্য, জেলা পরিষদে। পরিষদে আমরা চার-চার–ওর ভোটেই পাওয়ারে।

[শান্তনু অবাক চোখ নিয়ে নকুড়দাকে দ্যাখে। গীতিকে দ্যাখে। তারপর হেসে ফ্যালে।]

গীতি : মানে, ও তো সবে এল, এখনই আবার এসব কথা আলোচনার কী আছে?

নকুড়দা : আসলে শান্তনু এখানে থাকলে পুরনো মানুষজন আসবে। তখন নানান প্রশ্ন।

শান্তনু : নকুড়দা, আসল কথাটা হল সত্য ঘোষ চায় না যে আমি এখানে থাকি। তাই তো? কথাটা তুমি বলতে পারছ না।

[নকুড়দা চা খেতে থাকে। শান্তনুও চা খায়। নীরবতা। গীতি দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সামনে তাকিয়ে থাকে।]

শান্তনু : তার মানে পার্টিও আমাকে একজন খুনিই ভাবে।

নকুড়দা : এটা কী ঠিক কথা হল, তবে আমি কেন এসেছি?

শান্তনু : তুমি এসেছ পার্টির নির্দেশটা আমাকে শোনাতে। না হলে হয়ত তুমিও আসতে না। যাই হোক, এখন আমায় কী করতে হবে?

নকুড়দা : সেটা তুই ভাব।

শান্তনু : না আমার ভাবাভাবির কিছু নেই। পার্টিই তো যা ভাবার ভেবে ফেলেছে।

নকুড়দা : দ্যাখ্ শান্তনু, এভাবে উত্তেজিত হলে তো কথা বলা যাবে না। একটু ভেবে দেখলে বুঝবি যে এটা একটা সাময়িক অবস্থা। তোর মতো ছেলেকে দূরে রাখলে তো আমাদেরই ক্ষতি। আড়াই বছর তো কেটেই গেছে। আর দু বছর বাদেই ভোট। তারপর তো এই পরিস্থিতি থাকবে না। তখন তুই আবার এখানে এসে থাকবি।

শান্তনু : তাহলে এই দু বছরের জন্য আর একটা অপরাধ করে আমি জেলে গিয়ে বসে থাকি। আর পার্টি কি এখন জ্যোতিষীগিরি করছে নাকি, যে দু বছর পরে কী হবে তা এখনই বলে দিচ্ছে?

নকুড়দা : শান্তনু, তোর মানসিক অবস্থাটা আমি বুঝি। তুই হয়ত সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস না। পরে ভেবে দেখবি এটা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। তুই টাউনে থাকলে জটিলতাটা নানাভাবে ছড়াবে। তারপর তিলকে তাল করার লোকের অভাব নেই। অন্য দল এর মধ্যে থেকে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করবে। তাই বেশিরভাগ লোক জানাজানির আগেই...এই সব ভেবে বলা। আচ্ছা আজ চলি। তুই দ্যাখ।

[নকুড়দা ওঠে। শান্তনু একইভাবে বসে থাকে। গীতি নকুড়দাকে পেছন পেছন এগিয়ে দেয়। শান্তনু চুপ করে বসে থাকে। গীতি ফিরে এসে চেয়ারে বসে।]

শান্তনু : [অল্প হেসে] শর্তটা কাকে শুনিয়ে গেল, তোমাকে না আমাকে? কারণ তুমিই তো এই বাড়ির মালিক। কর্ত্রী।

গীতি : দ্যাখো, তুমি যখন ছিলে না, তখন কিন্তু আমার পাশে পার্টি ছিল। নকুড়দা ছিল, নরেন ছিল। সেটা ভুলে যেও না। সেই সব দিনে যখন ন'-দশ মাসের বাচ্চাটাকে নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি, তখন সদর স্কুলে চাকরিটা পার্টিই আমাকে দিয়েছিল।

শান্তনু : তোমার যথেষ্ট যোগ্যতা ছিল গীতি, সেটা একেবারে হেলাফেলার জিনিস নয়। হ্যাঁ, পার্টি হয়ত স্কুল কমিটিকে বলে কাজটা করিয়ে দিয়েছে।

গীতি : সেটা তো কম কিছু নয়। অন্তত সেই সময়ে।

শান্তনু : তাহলে এটা শুধুমাত্র একটা বিনিময় প্রথা। আমি দলের হয়ে একটা খুন করে জেলে গিয়েছি। দল তোমায় একটা চাকরি দিয়েছে। আবার আমি এখানে থাকব না। দল তোমাকে কিছু দেবে।

[গীতি আঁচলে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে ওঠে। আলো নেভে।]

তৃতীয় দৃশ্য

[সেই আলো-আঁধারি ঘরে একইভাবে বসে আছে শান্তনু। গায়ে চাদর দিয়ে উবু হয়ে।]

নেপথ্যে : ঝুলনের কাছে এতদিন আমি ছিলাম একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। আর তার মার তৈরি স্মৃতিকথা। এই প্রক্রিয়ায় বাবার যে অবয়ব সে দাঁড় করিয়েছিল তা ভাঙছে। আর সাথে সাথে হয়ত আরেকটা বৃত্তও তৈরি হচ্ছে মেয়েটার মনের মধ্যে। ঝুলন তো জানতে চাইতেই পারে তার বাবা খুনি কি না? জমি দখলের লড়াই হোক আর শ্রেণী সংগ্রামই হোক। অস্ত্র তোমার হাতে থাকলে আর রেহাই নেই। এই আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া তোমাকে খুনি বানিয়ে দেবেই। আমি বেঁচে আছি বলেই আজ হত্যাকারী।

[ঝপ করে এদিকে আলো নেভে। শান্তনু উঠে ওপারে ড্রইংরুমের চেয়ারে বসে। একটা বড় মুখোশ নিয়ে নাড়াচাড়া করে। সামনে ঝুলন বসে আছে।]

শান্তনু : ঝুলন, বল তো এটা কীসের মুখোশ?

ঝুলন : জানি। কীর্তিমুখ।

শান্তনু : [অবাক হয়ে] কী করে জানলি?

ঝুলন : মা বলেছে।

শান্তনু : মা আর কী বলেছে?

ঝুলন : আর? আর কিছু তো বলেনি! ওই, তুমি আর মা কোন দূরে একটা গ্রামের মেলায় বেড়াতে গিয়ে এটা কিনেছিলে।

শান্তনু : কীর্তিমুখ কোন দেবতার পেছনে থাকে জানিস?

[ঝুলন না সূচক ঘাড় নাড়ে।]

শান্তনু : মহাদেবের। কীর্তিমুখের গল্পটা মা কি তোকে বলেছে?

ঝুলন : এর আবার গল্প আছে নাকি?

শান্তনু : আছে আছে।

ঝুলন : [আগ্রহ নিয়ে] কী রকম? শুনি।

শান্তনু : শুনবি? একবার একটা অসুর দেবী দুর্গার রূপ দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। সে তখন দুর্গা ঠাকুরের কাছে গিয়ে খুব বাজে ইঙ্গিত করেছিল। এই চোখ-টোখ মেরেছিল আর কি।

ঝুলন : ধ্যাৎ।

শান্তনু : কিন্তু হল কি। মহাদেব যোগবলে জেনে ফেললেন ঐ অসুরের কীর্তিকলাপ। তিনি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে তৎক্ষণাৎ আরেকটা অসুর সৃষ্টি করলেন। তার ভীষণাকৃতি মুখ। বিশাল তার মুখগহ্বর। আর সে সব কিছু খেয়ে নিতে পারে। মানে তার কাজই হচ্ছে খেয়ে ফেলা। সেই হল কীর্তিমুখ।

ঝুলন : তারপর।

শান্তনু : কীর্তিমুখ জন্ম নিয়েই বলল, 'হে দেবাদিদেব, আদেশ করুন আমি কী খাব।' মহাদেব বললেন, 'যা ঐ দুষ্টু অসুরটাকে ধরে খেয়ে ফ্যাল।' কীর্তিমুখ ছুটল। ওদিকে সেই অসুরটাও মায়াবলে জেনে ফেলেছে মহাদেবের কাণ্ডকারখানা। সে তো পালাতে লাগল।

ঝুলন : তারপর, তারপর।

শান্তনু : অসুরটা পালাচ্ছে, পালাচ্ছে আর পিছনে পিছনে ছুটে আসছে কীর্তিমুখ। সারা পৃথিবী দৌড়ে ঐ অসুরটা একসময় বুঝতে পারল, কীর্তিমুখের হাত থেকে তার নিস্তার নেই। তখন সে সোজা এসে মহাদেবের পায়ে ডাইভ দিয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিল, 'আমি আর কখনও এরকম করব না। আমার স্যর অন্যায় হয়ে গেছে। হুজুর আপনি মা-বাপ [ঝুলন হাসতে থাকে]। এবারের মতো মাপ্ করে দিন। আমার প্রাণটা বাঁচিয়ে দিন।' মহাদেবের আবার দয়ার শরীর। বেশি কান্নাকাটি তিনি দেখতে পারেন না। তাই তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। যা তোকে ছেড়ে দিলাম। আর কখনও এরকম করিস না।' অসুরটা বলল, 'ক্ষেপেছেন! আর ও লাইনে আমি নেই। এই মা কালীর দিব্যি বলছি।'

[ঝুলন হাসে, শান্তনুও হাসে। শান্তনু একটা সিগারেট বার করে হাতে নেয়।]

ঝুলন : তারপর কী হল বলো।

শান্তনু : তারপর। ওদিকে ততক্ষণে কীর্তিমুখ এসে হাজির। এসেই সব শুনে সে রেগে কাঁই–'এটা কী হল দেব। আমি এখন কাকে খাব?' মহাদেব দেখলেন সত্যিই তো এ বেটাকে এখন কী খেতে দিই। মহাদেব বললেন, 'নে একটা কাজ কর, তুই নিজেকেই খেয়ে ফ্যাল।' কীর্তিমুখ তাই করল। সে নিজের হাত, পা, শরীর সব খেয়ে ফেলল মুহূর্তে। কিন্তু মাথাটা তো রয়ে গেল। নিজের মাথা খাবে কী করে? সে আবার মহাদেবকে বলল, 'হে দেব, এখন কী খাব?' মহাদেব দেখলেন এ তো ভারি আপদ। 'শোন, তুই আমার মাথার পেছনে হা করে থাক। যখন আমি খেতে বসব তখন খাবি।' সেই থেকে কীর্তিমুখ তার বিরাট মুখ হা করে মহাদেবের পেছনে বসে থাকে।

[শান্তনু উঠে ধীরে ধীরে মঞ্চের সামনে যায়।
ঝুলন বসে থাকে।]

শান্তনু : পার্টিটারও এখন এই কীর্তিমুখের অবস্থা। ধীরে ধীরে সে নিজেকেই খেতে শুরু করেছে। তার নীতি, আদর্শ, সংগঠন খেতে খেতে কী পড়ে থাকবে। শুধু মাথা, নাকি শুধু ফ্ল্যাগটা। কী পড়ে থাকবে ঝুলন?

ঝুলন : কী বাবা?

[গীতি প্রবেশ করে।]

গীতি : কী বাপ্ আর মেয়েতে কী কথা হচ্ছে?

ঝুলন : বাবা কীর্তিমুখের গল্পটা বলল। তুমি তো কখনও বলনি।

গীতি : কী মুখ?

শান্তনু : কীর্তিমুখ।

গীতি : ও, ঝুলন যাও পড়তে বসো। একটু পরেই তো মাস্টারমশাই আসবে।

[ঝুলন চলে যায়। শান্তনু এসে চেয়ারে বসে।]

শান্তনু : ভাবছি গ্রামের বাড়িতে চলে যাব।

গীতি : ওখানে তো এখন কেউ থাকে না। কত দিন হয়ে গেল তালাবন্ধ। ওটা কি আর বাসযোগ্য আছে?

শান্তনু : বেদখল তো হয়নি।

[শান্তনু আর গীতি পরস্পরের দিকে তাকায়।
আলো নেভে।]

চতুর্থ দৃশ্য

[সেই অল্প আলোয় চৌকির ওপর একই ভঙ্গিমায় বসে আছে শান্তনু। সিগারেট খাচ্ছে। কখনও দর্শকদের দিকে মুখ। কখনও মাথা নিচু। উবু হয়ে বসে।]

নেপথ্যে : অন্ধকার বনে নিজের চারিদিকে আগুনের বেড়া তৈরি করে বসে থেকেছি। পশুদের তফাতে রাখতে চেয়েছি। অন্ধকারে দেখেছি হারু ঘোষদের মতো শ্রেণীশত্রুদের চোখ জ্বলজ্বল করছে। ভয় পাইনি মোটেই। জানতাম এই আগুন পেরিয়ে আসার ক্ষমতা ওদের নেই। অথচ কখন যে সেই আগুনের তেজ কমে গেছে বুঝতেই পারিনি। আর অন্য পক্ষও আগুন টপকানোর খেলা শিখে গেছে দ্রুত।

[অন্য দিকে আলো জ্বলে ওঠে। জেলা পরিষদে সভাধিপতির ঘর। সত্য ঘোষ, নকুড়দা, পলাশ, নরেন সভাধিপতিকে ঘিরে বসে।]

সত্য ঘোষ : দেখুন এভাবে চললে তো আমাকে ভাবতে হবে।

নকুড়দা : একদম তড়পাবে না বুঝেছ। যে লেজটা দিয়ে তুমি খেলাতে চাইছ, সেটা কাটতেও আমরা জানি।

সভাধিপতি : আঃ, নকুড়বাবু কি হচ্ছেটা কী?

সত্য ঘোষ : এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আমাকে কিন্তু অন্য রকম ভাবতে আপনারা বাধ্য করছেন। সতেরো তারিখের সাংস্কৃতিক নাইটের আর্ধেকের বেশি টাকা কিন্তু এই শর্মাকেই তুলতে হচ্ছে সেটা ভুলে যাবেন না। এখন...

সভাধিপতি : ঠিক আছে, ঠিক আছে। সত্যবাবু, এখন এখানে ও বিষয়ে আলোচনা করা যাবে না। আমি পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব।

সত্য ঘোষ : না, দেখুন...আমি এমন বলেছি...মানে

সভাধিপতি : আঃ হা, আমি তো আপনাকে বলছি এখন এসব নয়। আমি পরে...

[সত্য ঘোষ শব্দ করে চেয়ারটা সরায়। তারপর হন্‌হন্ করে বেরিয়ে যায়।]

সভাধিপতি : আচ্ছা আপনারাও হয়েছেন। এই কথাটা এই সময়ে বলতে হবে। এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম। কলকাতা থেকে নামী দামি আর্টিস্ট আসছে। এই শহরের সুনামটা তো রাখতে হবে, না কি?

নরেন : নকুড়দা ঠিক কথাই বলেছে। শান্তনুদা সম্বন্ধে এরকম একটা শর্ত আরোপ করার সাহস পায় কোথেকে? এটা আমাদের পার্টির অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। আমরা বুঝব। আজ শান্তনুদা ওর গ্রামের বাড়িতে চলে গেল। আমি মনে করি এটা দলের একটা নৈতিক পরাজয়।

পলাশ : আর ঐসব সাংস্কৃতিক নাইট-টাইট করে কোন সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করছি আমরা। এ সবে কার লাভ এটা ভেবে দেখা দরকার।

সভাধিপতি : আঃ, তোমরা বুঝতে পারছ না। আমি যা করছি সেটা তো আমার একার ডিসিশন নয়। পার্টির সবার সম্মতি ছিল। এখন তো পিছিয়ে আসা যায় না। আর এখন সত্য ঘোষকে তোল্লা না দিলে সব বেগড়বাই করে দেবে। এভাবে বাড়তে বাড়তেই ও, ওর নিজের পতন ডেকে আনবে।

নকুড়দা : আপনি যেটা ভাবছেন আদপেই জল সেদিকে গড়াচ্ছে না। এই অনুষ্ঠানটা যে মূলত সত্য ঘোষের জন্যই হচ্ছে সেটা শুধু টাউনে নয় সারা জেলাতেই বেশ ভালভাবে ছড়িয়েছে। যারা ওর নাম জানত না তারাও এই সুবাদে নামটা জেনে ফেলেছে।

পলাশ : আপনি জানেন ওর এলাকায় তিনটে ক্লাবকে ও কালার টিভি দিয়েছে। দুটো ক্লাবকে ক্যারম বোর্ড। তাও জেলা পরিষদের কন্ট্রাক্টরদের ওপর চাপ দিয়ে। সত্য ঘোষ ওর কাজ ঠিকই করে যাচ্ছে। আমরা শুধু কপচাচ্ছি।

নরেন : ক্লাবের ছেলেরা তো সত্যদা বলতে অজ্ঞান। ওর কথায় উঠছে, বসছে।

সভাধিপতি : সত্য ঘোষ পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে। কী আর করা যাবে। ওকে তো ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না।

নরেন : কিন্তু বাড়াবাড়িটা তো আটকানো যায়। যেটা আপনি পারেন।

নকুড়দা : সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা নয়, সাংস্কৃতিক নাইট। বেলেল্লাপনার চূড়ান্ত। বদনামটার ভাগ কিন্তু সত্য ঘোষ নেবে না, সেটা বুঝে কোন শিল্পী আসবে, কে আসবে না সে কি আমরা ঠিক করতে পারতাম না? যাক এখন আমি উঠছি, আমার একটা মিটিং আছে।

সভাধিপতি : আরে আসল কথাটাই তো হল না...

নকুড়দা : কী, শান্তনুর কথা?

সভাধিপতি : আরে না, বলছি এত বড় একটা ফাংশন। সিকিউরিটি, ভলান্টিয়ার্স এসব ব্যবস্থা তো আমাদেরই ঠিক করতে হবে। আমাদের ছেলেদের একটু মোবিলাইজ করুন।

নকুড়দা : পলাশের মুখে শুনলেন না, কালার টিভি আর ক্যারম বোর্ডের গল্প।

সভাধিপতি : মানে?

নরেন : ঐ সব ক্লাবের ছেলেরাই কাজকর্মে নেমে পড়েছে। ওখানে আমাদের ছেলেপিলেরাও আছে। কিন্তু যে উৎসাহে ওরা বেগার খাটছে তা যে ঐ টিভি আর ক্যারম বোর্ডের মাহাত্ম্য তা বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না।

পলাশ : আর পার্টি প্রোগ্রামে এক-একজনকে ডেকে ডেকে পাওয়া যায় না।

সভাধিপতি : ও, কাজের ছেলেপিলে আছে তাহলে? আমি ঐ ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তায় ছিলাম আর কি। জেলার একটা সম্মানের ব্যাপার...

[সভাধিপতি চোখে চশমা লাগিয়ে ফাইল দেখতে শুরু করে। অন্যরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। আলো নেভে।]

পঞ্চম দৃশ্য

[সেই আলো-আঁধারিতে শান্তনু বসে। একই ভঙ্গিমায়। হালকা হাওয়া। বৃষ্টির শব্দ। শব্দটা বাড়ে। বিদ্যুৎ চমকায়। শান্তনু বসে থাকে। ছাতা বন্ধ করতে করতে দ্রুত পায়ে ঘরে ঢোকে গীতি।]

গীতি : জানো একটাও গাড়ি চলছে না, ফিরে এলাম। ঝুলনটা বাড়িতে একা একা কী করবে!

[দু'জনে দু'জনের দিকে তাকায়।]

গীতি : কী ব্যাপার। সদর থেকে শুরু করে সব দরজা জানলা খোলা। তুমি কি এভাবেই থাকো নাকি প্রতিদিন? আমি যাওয়ার পর থেকে কি এভাবেই খাটে বসে আছ?

শান্তনু : হারু ঘোষের মৃত্যু কি শুধুই ব্যক্তি হত্যা? তবে শ্রেণী সংগ্রাম কী?

গীতি : আরে তুমি তো পাগল হয়ে যাবে দেখছি! সারাক্ষণ কি এসবই ভেবে চলেছ?

শান্তনু : না গীতি তুমি বলো। তুমি তো জানো সেই দিনের কথা। তবে? আমরা কী করতে চেয়েছিলাম।

গীতি : শান্তনু, আমি জানি, আমি জানি।

শান্তনু : কী জানো বলো গীতি। তুমি বলো...

[একটা মিউজিক ইন করে। গীতি চৌকির ওপর বসে। শান্তনু মঞ্চের অন্য দিকে সরে যায়। ধীরে ধীরে সেদিকটা আলো হয়ে ওঠে। একদল মানুষ লাল পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে। শান্তনু তাদের পুরোভাগে। সবাই হাঁটার ভঙ্গি করে। গীতি বলে যায় সামনে তাকিয়ে।]

গীতি : হারু ঘোষের জমি বর্গা হবে। তোমরা কয়েকশ মানুষ দৃপ্ত ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছিলে সেই জমির দিকে। প্রত্যেকের চোখে প্রত্যয়, উন্মাদনা। সকালের রোদে চকচক করছে সবার মুখ। লাল পতাকা আলোড়িত হচ্ছে। সবার মুখে ধ্বনিত হচ্ছে স্লোগান...

সমবেত : ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। স্বৈরাচারী, অত্যাচারী হারু ঘোষ নিপাত যাক–নিপাত যাক–নিপাত যাক।...ইনকিলাব জিন্দাবাদ, লাঙ্গল যার–জমি তার, লাঙ্গল যার–জমি–তার। লাল ঝান্ডা করে পুকার–ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

গীতি : কিন্তু হারু ঘোষের জমির সামনে পৌঁছতেই হঠাৎ সমস্ত মিছিলটা থমকে দাঁড়াল। জমির অন্য প্রান্তে হারু ঘোষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। সঙ্গে কয়েকজন লোক। প্রত্যেকে সশস্ত্র। আর হারু ঘোষের হাতে দোনলা বন্দুক। মৃত্যুর মতো কালো। হারু ঘোষ চিৎকার করে

উঠল–

নেপথ্যে : যে আমার জমিতে পা দেবে, গুলি মেরে তার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। শালা।

গীতি : কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। তুমি মিছিলের একজনের হাত থেকে একটা বল্লম ছিনিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলে।

শান্তনু : আমাকে তো এগোতেই হত। কারণ সেই মিছিলে আমিই তো ছিলাম দলনেতা। গ্রামে হারু ঘোষকে ভয় পায় না এরকম লোকই ছিল না। তাদের সেই স্থবিরতা ভাঙতে আমি বল্লম হাতে এগিয়ে গেলাম, সোজা। আমার দেখাদেখি সবাই। আমি দেখলাম হারু ঘোষ হঠাৎ তার বন্দুক তুলে নিয়েছে কাঁধে। আর বন্দুকের নল সরাসরি আমার দিকে তাক করা। হঠাৎ...হঠাৎ আমার মনে হল লোকটা সত্যি সত্যিই গুলি চালাবে আর আমি মরে যাব। একটা ঠাণ্ডা রক্তস্রোত নেমে গেল শিরদাঁড়া দিয়ে। আর আমি...আমি যে কিনা তার আগে বল্লম কোনও দিন ছুঁয়েও দেখিনি, হঠাৎ সেই বল্লম ছুঁড়ে দিলাম হারু ঘোষের দিকে। হারু ঘোষও গুলি ছুঁড়ল।

[গুলির শব্দ হবে। শান্তনু মাটিতে শুয়ে পড়বে। তার পরই প্রবল পাখি, কাক, শালিকের ডাক পাঞ্চ করা সমস্ত মঞ্চ জুড়ে। ধীরে ধীরে শব্দটা কমে আসবে।

সাময়িক বিরতি।]

গীতি : সবাই দেখল তোমার ছুঁড়ে দেওয়া বল্লম হারু ঘোষকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে। চাপ চাপ রক্তের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে হারু ঘোষ। আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা দূরের আলপথ ধরে ছুটে পালাচ্ছে।

শান্তনু : আমি এসব কিছুই দেখিনি। আমার মাথার কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া কঠিন মৃত্যুর কথা ভেবে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিলাম। আর মাঠের সাথে মিশে থাকা পাখিরা গুলির শব্দে সমস্ত আকাশ জুড়ে যে কলরব আর ওড়াউড়ি শুরু করেছিল, আমি তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কেন আমি সেদিকে তাকিয়ে ছিলাম?...মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা মানুষ কী করে? সে তো পাখি দেখবেই গীতি।

গীতি : কে যেন কোর্টে সাক্ষী দিতে এসে বলেছিল–হারু ঘোষের নিশানা ঠিকঠাক থাকলে ওই ফেলে দিত শান্তনুকে।

শান্তনু : [গীতিকে আঁকড়ে ধরে] তবে, তবে কেন সব হিসেব ওলোটপালট হয়ে যায়? ...আমি বেঁচে আছি বলেই কি হত্যাকারী?...বলো গীতি, আমার আদর্শের সেই মাটি আজ কোথায়? বলো, ভালবাসার শিকড়গুলি এভাবে কেন শুকিয়ে যাবে?

[শান্তনু গীতিকে ধরে খাটের ওপর শুইয়ে দেয়।]

গীতি : না, শান্তনু।

[মঞ্চটা অন্ধকার। তার মধ্যে থেকে গীতির কথা শোনা যায়।]

গীতি : শান্তনু, আঃ, আমরা কিন্তু সাবধান নই। যদি কেউ এসে পড়ে এই পৃথিবীতে। আবার এই পৃথিবীতে...নতুন কেউ...

[আলো জ্বলে। শান্তনু গীতিকে আস্তে করে ছেড়ে দেয়। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়। স্থির হয়। গীতি বিস্রস্ত অবস্থায় উঠে বসে চৌকির ওপর। শান্তনু ফ্রন্ট স্টেজের দিকে এগিয়ে যায়। কোণাকুনি। অন্য প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ায়। গীতি চৌকির ওপর বসে থাকে স্থির।]

নেপথ্যে : প্রত্যেকেই আমরা ঢুকে পড়ছি নিজস্ব সৃষ্ট বৃত্তের ভেতরে। সেখানে নিঃশব্দ, সমস্ত শব্দকে খেয়ে নেয়। আমরা কি তবে চলে যাচ্ছি একটা সার্বিক বন্ধ্যাত্বের পৃথিবীতে। নাকি পা থেকে খেতে খেতে উঠে যাব ওপরের দিকে। প্রত্যেকে হয়ে উঠব এক-একটা কীর্তিমুখ।

[হালকা মিউজিক। পর্দা পড়বে।]■

নাট্যস্বত্ব : শবর রায়

কথাবার্তায় পীযূষ ভট্টাচার্য

এই ক্রোড়পত্রের মূল উদ্দেশ্য, ১০০% পীযূষ ভট্টাচার্যকে মেলে ধরা। তবুও এই সংখ্যায় ওঁর কোনও গল্প প্রকাশ করা হল না। কারণ–:

(১) যাঁরা পীযূষদা-র গদ্যের সাথে পরিচিত নন, তাঁরা ওঁর কেবল মাত্র একটি গল্প মারফৎ কোনও ধারণা গড়ে তুলুন, সেটা আমাদের অভিপ্রেত নয়। কারণ পীযূষ ভট্টাচার্য যে ধারার গদ্যশিল্পী তাতে অন্তত একটি গল্পসংকলন না পড়ে ওঁর রচনা সম্পর্কে কোনও ধারণা গড়ে তোলা সমীচীন হবে না।

(২) যাঁরা পীযূষদা-র গদ্যের সাথে পূর্ব-পরিচিত, তাঁদের চিন্তা-ভাবনাগুলো বিশিষ্ট আলোচকদের মতামতের সাথে মিলিয়ে নেয়ার সুযোগ করে দিতেই এই ক্রোড়পত্র। সেক্ষেত্রে আরেকটি নতুন গল্প বাহুল্য মাত্র।

এই ক্রোড়পত্রে যদিও পীযূষ ভট্টাচার্যের গদ্যরীতি, বুনন কৌশল, সঠিক পাঠ পদ্ধতি তো বটেই এমনকী ব্যক্তিগত প্রসঙ্গও বাদ পড়েনি তবু শুধু মাত্র এটুকু দিয়ে যে ১০০% পীযূষ ভট্টাচার্যকে আবিষ্কার করা যাবে না, সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। কেননা আলোচনার মাধ্যমে পাঠক মূল রচনাকারের চিন্তাভাবনার মাত্র ২০% আবিষ্কার করতে পারেন, আর মূল রচনা পাঠের মাধ্যমে মাত্র ৫০%। বাকি ৩০% কিংবা ৫০%-এর জন্য প্রয়োজন লেখকের সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তা। উদাহরণ–রবীন্দ্রনাথ। নাহলে ওঁকে অতো অজস্র প্রবন্ধ লিখে যেতে হত না এবং রবীন্দ্রদর্শন বোঝাতে রাবীন্দ্রিকদেরও প্রয়োজন হত না ওঁর প্রবন্ধ থেকে কোটেশন টানার।

এটা কারও ব্যর্থতা নয়, শিল্পের সীমাবদ্ধতা। সহজ কথাও সরাসরি বলা যায় না। কারার ঐ লৌহকপাটও দাদরা ছন্দে ভাঙতে হয়।

সে যাই হোক, যাঁরা পীযূষ ভট্টাচার্যের লেখার সাথে পরিচিত নন তাঁদের ৭০%-এ পৌঁছে দিতে এবং যাঁরা পূর্ব-পরিচিত তাঁদের কাছে বাকি ৫০% তুলে ধরতে কথা বলেছি পীযূষ দা-র সঙ্গে। ক্রোড়পত্রের শেষ পাতে পরিবেশিত হল সেটা, হে পাঠক, আসুন...

গল্পবিশ্ব : আচ্ছা পীযূষদা, লেখালেখির শুরু বলে কিছু হয় না, কেননা লেখালেখি

এমন একটি প্রক্রিয়া যেটা অনেকদিন থেকে ভেতরে ভেতরে চলতে থাকে, তারপর রূপ পায় ছাপার অক্ষরে, সেই অর্থে জানতে চাইছি আপনার প্রথম লেখা কী ছিল? গল্প না কবিতা? কোথায় তা প্রকাশ হয়েছে?

পীযূষ : প্রথম লেখা কবিতাই। 'কৃন্তন' বলে একটা কাগজ, আমরা নিজেরাই করেছিলাম, সেখানেই প্রকাশিত।

গল্পবিশ্ব : আপনি তো অনেকগুলো কবিতা লিখেছেন, আপনার একটা কবিতার বইও আছে। ইদানীং আপনাকে আর কবিতা লিখতে দেখি না–এটা কেন হল?

পীযূষ : কবিতার একটা মাত্র বই বের হয়েছিল 'মহিম্ন অসুখ মহিম্ন যন্ত্রণা'–আগের লেখা কবিতা নিয়ে ১৯৯২-এ। ইদানীং সেই অর্থে কবিতা লিখি না। কেননা যেভাবে গদ্যটা লিখবার চেষ্টা করি তা কবিতাকেই স্পর্শ করে থাকে। আর এ হচ্ছে ভারতীয় বাঙালির ঐতিহ্যনুসারে কাব্য গীতিময়তার গদ্য। এই গদ্যে মনোনিবেশ করবার জন্য কবিতা দূরে চলে গেছে। ইউরোপে কিন্তু আগে গদ্য পরে কাব্যের শুরু। একমাত্র আমাদের বেলাই উল্টো। আর হঠাৎ হঠাৎ তো কবিতা আসে না–যদি কখনও শুরু হয় তখন দেখা যাবে।

গল্পবিশ্ব : এই যে দুটো মাধ্যম, গল্প এবং কবিতা , (আরও মাধ্যম আছে,) এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বলে থাকি গল্প কোনও কোনও সময় কবিতা হয়ে ওঠে–এরকম একটি জায়গা দিয়ে থাকি কবিতাকে, আপনি কি কবিতা ও গল্পের মধ্যে কোনও ফারাক দেখতে পান? যদি না পান তবে কবিতা ছেড়ে গল্পে এলেন কেন?

পীযূষ : কবিতায় যেটা বলতে হয় তার সমস্তটা প্রতীকের মাধ্যমে। যেহেতু কবিতা একদম সীমিত শব্দ নির্ভর–

গল্পবিশ্ব : ভাব নির্ভর নয় কি?

পীযূষ : শব্দ সহ ভাব নির্ভর। কবিতায় বড্ড বেশি ভাব নির্ভরতার জন্য এক সময় মনে হল আমার অনেক কিছু বলবার আছে, তা হচ্ছে না। এ অবশ্য গল্প লিখতে শুরু করবার পর মনে হয়েছে। গল্প বা গদ্যের জায়গাটা অনেক বিস্তৃত বলেই গদ্য লেখা। এখন এভাবেই লিখছি–নিজের কথা বলে যাবার চেষ্টা।

গল্পবিশ্ব : আবার একটা খুব ফরমাল বা আনুষ্ঠানিক প্রশ্ন। একজন লেখকের দায়বদ্ধতা। সামাজিক-রাজনৈতিক। আপনি তো লিখছেন আপনার কাছে বিষয়টা কীরকমভাবে ধরা দেয়?

পীযূস : লেখকের কোনও দায়বদ্ধতা নেই। কেননা লেখক একা সমাজ পাল্টাতে পারে না। গড়তে বা ভাঙতেও পারে না। লেখকের একমাত্র দায়বদ্ধতা সত্যকে অনুসন্ধান করে যাওয়া। আমি যেখানে থাকি, গ্রামীণ অঞ্চল, সেখানে সত্য এত ক্রুড আকারে আসে সে ক্রুডিটি সাহিত্যে আসে না। পরিষ্কারভাবে বলছি–আনা যাচ্ছে না। সত্যটাকে অনেক পালিশ করে, চাকচিক্য করে সাহিত্যে আনছি। ক্রুডিটি ঠিকঠাক সাহিত্যে প্রকাশ

করতে পারা বা সত্যটাকে উদ্ঘাটন করতে পারাই হচ্ছে লেখকের কাজ।

গল্পবিশ্ব : শুধু মাত্র কি সত্য প্রকাশ?

পীযূষ : সত্য প্রকাশের দায়বদ্ধতা–এটাই একমাত্র কাজ। আর যদি কোনও দায়বদ্ধতা থাকে তা হচ্ছে, ভালভাবে অর্থাৎ সাহিত্যের শর্ত মেনে ভালভাবে লিখে যাওয়া। ভাল লেখা।

গল্পবিশ্ব : সত্য প্রকাশ করাটাই যদি লেখকের কাজ হয় তবে লেখকের রাজনৈতিক মতাদর্শের স্থান কোথায়?

পীযূষ : এই রাজনৈতিক লেবেল মারবার বিষয়টিতে আমার আপত্তি। অলোক তুমি লক্ষ্য করে দেখবে, সব কিছুই কোনও না কোনও ভাবে রাজনৈতিক। তাই লেখাকে রাজনৈতিক ছাপ মারাটাই হচ্ছে একটা গোলমেলে বিষয়। এক-একজন লেখকের এক-এক রকম আদর্শ থাকে, অপছন্দের আদর্শের লেখা হলে সেটা বাতিল হয় না, সাহিত্যগুণ থাকলে সেটা লেখা। আমরা যেমন মার্কসীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ। লক্ষ্য করে দেখবে যে, বহু মার্কসীয় আদর্শে বিশ্বাসী লেখক বিচিত্র বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন।

গল্পবিশ্ব : যেমন?

পীযূষ : যেমন মার্কেসের নাম প্রথমেই বলতে হয়। তিনি তো নিজেকে মার্কসিস্ট বলেন। তিনি উৎফুল্ল যৌনতা যাকে বলা হয় তা নিয়ে কাজ করেছেন, তাঁর লেখাতে স্যাটায়ার যেমন আছে তেমন গভীর জায়গা থেকে বাস্তবকে তুলে নিয়ে এসে মোড়কে উপস্থাপনাও আছে। এ কিন্তু রিয়ালিটির ধর তক্তা মার পেরেক নয়।

মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব বলে একটা কথা আছে, তাই তুমি যদি চিলির লেখিকা সালভেদার আলেন্দ্রের ভাইঝি ইসাবেল আলেন্দের 'এরিমিন্দার খেলা' গল্পটি দেখ, সেখানে গল্পের সমস্ত শরীর জুড়ে উৎকট যৌনতার ছড়াছড়ি। যৌনতার এরকম অসহায়তা উপনিবেশবাদের কাছে যে আঁতকে উঠতে হয়। এসবই তো মার্কসীয় লেখা।

গল্পবিশ্ব : যৌনতার বিষয়টা কি এখানকার মার্কসীয় ট্যাবু?

পীযূষ : ট্যাবু কিনা জানি না তবে একটা ছক তৈরি করবার চেষ্টা তো আছেই। বাস্তবতাকে সহজ ও বোধগম্য করবার ফতোয়া দেন স্তালিনপন্থীরা। তাতে আপত্তি তো আছেই। আর এ হচ্ছে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বর বাইরের ব্যাপার স্যাপার।

গল্পবিশ্ব : তবে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব কী জিনিস?

পীযূষ : আমরা যে ভাবে লিখছি সেটাই হচ্ছে তত্ত্বের অনুসরণ, এরকমই বিশ্বাস।

গল্পবিশ্ব : আপনি বলতে চাইছেন যে কোনও সত্য যে রকম অবস্থায় থাকুক না কেন তাকে মুক্তি দেওয়াটাই গদ্যকারের কাজ?

পীযূষ : প্রধান কাজ।

গল্পবিশ্ব : এই সত্য যদি সদর্থক না হয়?

পীযূষ : এই শ্রেণী বিভক্ত সমাজে কার পক্ষে যাবে এ বলা যাবে না। সবাই

ডিক্লাসড বা শ্রেণী বিভাজনও সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এটাও বুকে হাত দিয়ে বলা যাবে না। এসব মাপবার জন্য ব্যারোমিটার বা থার্মোমিটার আবিষ্কার যখন হয়নি লেখককে রিস্ক নিতেই হবে। রিস্ক থেকেও যাচ্ছে।

গল্পবিশ্ব : আপনার প্রিয় লেখক, কোন কোন লেখকের কাছ থেকে আপনি অনুপ্রেরণা পেয়েছেন? বাংলা ভাষার, বিদেশি সাহিত্যের নয় কিন্তু–

পীযূষ : একদম প্রথম যখন লিখতে আসি তখন মহাশ্বেতা দেবীর লেখা এবং ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম। তিনি একটা রুক্ষ সময়ের ভিতর থেকে সাহিত্যের বিষয়টাকে নিংড়ে আনতেন। তখন ভাল লাগত। একসময় দেখলাম আমি এতে সন্তুষ্ট হতে পারছি না, আমি মানে আমার লেখক সত্তা। তারপর সেখান থেকে শিফ্‌ট করেছি। অমিয়ভূষণ মজুমদারের কাছে গেলাম কমলকুমার মজুমদার ছুঁয়ে। তবে, কমল কুমার মজুমদার আমার প্রিয় লেখক নন। এরপর দেবেশ রায়ের লেখা থেকে গদ্যটা শিখে নিজের মতন সাজিয়ে নিয়েছি। এই পর্যন্তই–

গল্পবিশ্ব : আপনি রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, মানিক, বিভূতিভূষণ এঁদের কারও নাম বললেন না! এঁদেরকে তো বাংলা সাহিত্যের মাইলস্টোন বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ বাঙালিকে ভাষা জুগিয়েছেন, মানিক বাঙালি লেখককে রাজনৈতিক চেতনা দিয়েছেন–

পীযূষ : এঁদের কাছ থেকে সেরকম কোনও সাহায্য নিইনি। আর খুউব বেশি পড়াশোনাও আমার নেই। লিখতে গেলে এঁদের লেখা যতটুকু পড়ে নিতে হয় ততটুকুই পড়া। যদি বলা হয় রবীন্দ্র রচনাবলীর অমুক গল্পটা কি? যে সব গল্প আলোচিত হয়ে থাকে প্রধানত তার বাইরে হলে না দেখে বলতে পারব না।

গল্পবিশ্ব : কেন?

পীযূষ : কারণ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গল্প আমাকে বিশেষ টানেনি। লেখাকে যখন সিরিয়াসলি নিলাম তখন তো নিজের লেখার বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত, রেফারেন্স বই তো পড়তে হয়। অত পড়লে লিখব কখন? আমার অ্যাকাডেমিকাল কোয়ালিফিকেশন যা তাতে এসব পাঠ্যতালিকায় ছিল না। থাকলে ভাল হত। যে সময়ে মানুষ সব কিছু পড়ে সেই সময়টায় আমি ট্রেড ইউনিয়নের প্রায় হোলটাইমার ছিলাম। অত পড়বার সময় পাইনি।

গল্পবিশ্ব : আপনার লেখা পড়ে বিশ্বাস করা যায় না আপনি এঁদের লেখা পড়েননি।

পীযূষ : সময়ের চাপে পড়তে হয়েছে অবশ্যই, কিন্তু ওখানে আটকে থাকার কোনও তাগিদ অনুভব করিনি। সবসময়ই সামনের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছি–পেছনের দিককার বিষয়গুলি নিয়েই এগোনো। সব কি সঙ্গে নেওয়া যায়, তাই গ্রহণ ও বর্জন তো থাকেই। তবে, এটা বা ওটা পড়তেই হবে, না হলে পিছিয়ে গেলাম, তার মধ্যে আমি নেই। এর জন্য কোন হীনম্মন্যতাও নেই। সারা দিন পড়লে লেখার সময় কোথা

থেকে আসবে! এমনিতেই লিখতে আমার ভীষণ সময় লাগে।

গল্পবিশ্ব : আপনার লেখার ভঙ্গিটাই জটিল। এই জটিলতা কি ইচ্ছাকৃত না আপনার প্রকাশ ভঙ্গিটাই এরকম?

পীযূষ : এবারে লিখবার প্রক্রিয়ার কথাটা বলতেই হচ্ছে। লিখতে শুরু করবার আগে লিখবার বিষয়টা ঠিক করে নিই। বিষয় ঠিক করবার পর বিষয়টা বলব কীভাবে ঠিক করতে অনেক সময় লেগে যায়। এরকমও দেখা গেছে, কোনও কোনও গল্প পরিষ্কার মিথ দিয়ে শুরু করেছি, কোনওটা আবার ইমেজ দিয়ে, আবার কোনওটা একেবারে প্রবন্ধের মতন করে শুরু। যেহেতু বিষয়টাই প্রধান সেহেতু আমাকে সাবধান থাকতে হয় গল্পটা প্রবন্ধ না হয়ে যায়। আর এভাবে লেখা হয় না বলে জটিল মনে হয়। কিন্তু আমরা ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে পড়ে সহজেই মার্কেস বুঝি, কিন্তু মার্কেস তো ভীষণ জটিল। আতসকাচের নীচে মার্কেসকে রেখে আমাকে পড়তে হয়েছে। বিদেশি যে কোনও লেখা পড়বার আগে সেখানকার ভূগোল, ইতিহাস জেনে নিয়েছি। সারামাগো পড়বার আগে তারই লেখা Journey to Portugal পড়েছি। এসব তো আমার পড়বার পদ্ধতি। কিন্তু মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এগুলো পড়বার সময় জটিল লাগবে না আমাদের লেখা পড়বার সময় জটিল মনে হবে! আর এটা হচ্ছে আমাদের মতন লেখকদের হীনম্মন্য করে দেবার কৌশল।

গল্পবিশ্ব : Myth, Allegory, Metaphor আপনাকে কিন্তু বেশি মাত্রায় টানে

পীযূষ : যেমন পেন্টিং। সুরিয়ালিস্ট পেন্টিংয়ের আমি ভক্ত। পেন্টিংয়ে যেভাবে রঙ চাপানো হয় সেভাবেই আমি লেখাতে মিথের রঙ ব্যবহার করবার চেষ্টা করি। মিথ এমনই একটা শক্তি আমাকে সত্যকে খুঁজে পাবার রাস্তার সংকেত দেয়। Allegory আর Metaphor তো আমার লেখালেখির আশ্রয়। বেশিমাত্রায় টানা শুধু নয় আমি বিশ্বাস করি বাঙালির জীবনদর্শনের মূলেই রয়েছে মিথ।

গল্পবিশ্ব : আপনার গল্প পড়ে মনে হয়েছে গল্পে psychological treatmeant-ই প্রধান। তা কি স্বীকার করেন?

পীযূষ : অস্বীকার করবার কোনও জায়গা নেই। যদিও ব্যক্তি মানুষই গল্পে প্রধান চরিত্র, ব্যক্তি মানুষের উপর সোসিও কন্ডিশনের চাপে ব্যক্তি মানুষের রিয়্যাক্ট করবার গল্পই লিখি। টানাপোড়েনটাই প্রধান।

গল্পবিশ্ব : ঘটনা নয়, ঘটনার প্রতিক্রিয়াটি আপনার গল্পের উপজীব্য বিষয় হয়ে ওঠে কেন?

পীযূষ : এই মুহূর্তে তোমাকে কেউ যদি ঘুষি মারে, ঘুষি মারাটা আমার কাছে কোনও গল্প নয়। ওটা ঘটনামাত্র। ঘুষি মারবার পর রক্তপাত, যন্ত্রণা ভোগটাই আমার কাছে গল্প। সেখানে ঘুষি মারবার কারণটাই শুধুমাত্র থাকে।

গল্পবিশ্ব : আমাদের চারপাশে যা লেখা হচ্ছে সেখানে কিন্তু এই ঘুষি মারাটাই

প্রধান। কে কোন ভঙ্গিতে, হাত কতখানি পিছনে নিয়ে, কোন অ্যাঙ্গেলে, কী রঙের জামা পরে ঘুষি মারছে এসব নিয়েই বেশি লেখা হচ্ছে। এই বিষয়টা আপনি কীভাবে দেখছেন?

পীযূষ : হোক না। একটু অন্যভাবে না হয় থাকলাম। কী আর করা করা যাবে!

গল্পবিশ্ব : আপনার মতো নয় যে সব লেখা হচ্ছে তা কি আপনি পড়েন?

পীযূষ : নিকট জনের লেখা হলে পড়ি, তার বাইরে নয়।

গল্পবিশ্ব : নিকট জনেরই লেখা কেন পড়েন?

পীযূষ : নিকট জনেরা কেমন কাজ করছেন জানতে হয়। এতে যাচাই করা যায় নিজের কাজটা।

গল্পবিশ্ব : প্রতিদ্বন্দ্বিতা বোধ কাজ করে কি?

পীযূষ : হ্যাঁ করে। প্রতিযোগিতাও।

গল্পবিশ্ব : লেখক হিসেবে কীভাবে দেখতে চান নিজেকে?

পীযূষ : মারা যাবার পরও লেখক হিসাবে বেঁচে থাকতে চাই। কিছুই তো হল না, লেখক হিসাবে এই একমাত্র চাওয়া এখন। সব মানুষই নিজেকে বিশিষ্ট হিসাবে দেখতে চায়, আমিও চাই। জন্মের পর যখন নিজের চুল নিজে আঁচড়াতে শিখলাম, এই টেরি বাগাতে শেখাটাই নিজেকে বিশিষ্ট হিসাবে প্রজেক্ট করা। সব মানুষ নয়, সব লেখকই চায় তার সৃষ্টি সহ একক হিসাবে বেঁচে থাকতে। আমিও চাই।

গল্পবিশ্ব : এই ব্যাপারে আপনি 'যৌথতা' শব্দটা কীভাবে দেখেন?

পীযূষ : লেখা কখনই যৌথ উদ্যোগ হতে পারে না। যার যার লেখা তার তার। তুমি আমার মতন লেখ না, আমি তোমার মতন না। যে যার মতন কাজ করছি বলে তোমাকে হন্ট করেছে, পীযূষদাকে নিয়ে সংখ্যা করা উচিত। যদিও সিদ্ধান্তটা তোমার একক, কিন্তু উদ্যোগটা কিন্তু যৌথ। ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে থাকতাম কখন ঝড় উঠবে তার অপেক্ষায় থাকতে হত। কেননা তখন তালগাছে ওঠা যাবে। লেখালেখির ক্ষেত্রে এসব হয় না। তবে লেখা প্রকাশ, লেখার আলোচনার জন্য অবশ্য যৌথ আন্দোলন করা যেতেই পারে।

গল্পবিশ্ব : এই যে স্বাতন্ত্র্য, আপনি আপনার লেখায় প্রতিটি সিনটেক্সে, দাঁড়ি-কমার মধ্য দিয়ে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবারই কেন চেষ্টা করেন?

পীযূষ : ল্যাঙ্গুয়েজের বিষয়ে বলতে গেলে প্রথমে যা বলেছি তাতে ফিরে আসতে হবে। বিষয়টা ঠিক করবার পর অনেকদিন অপেক্ষা করি, তারপর যখন লেখা শুরু হয়ে যায় মস্তিষ্ক যেমন যেমন নির্দেশ দেয় সেই অনুযায়ী সিনটেক্স ব্যবহার করি। সব মানুষের কথা বলবার একটা নিজস্ব স্টাইল থাকে। আমার স্টাইলটা এরকম। এর ফলে কতখানি গ্রামার মানা হল তা আমার ভাববার বিষয় নয়। ওগুলো গ্রামারবাজ, শিক্ষক-অধ্যাপকদের জন্য থাক না কেন।

গল্পবিশ্ব : এতে তো পাঠকের অসুবিধা হয়। আপনি কি চাইছেন পাঠক শিক্ষিত হয়ে বিশেষ করে স্টাইলটা জেনে তবেই পড়বেন?

পীযূষ : প্রথমেই বলেছি অসুবিধা মনে করলে অসুবিধা। অসুবিধা না মনে করলে অসুবিধা না। কোনও লেখা পড়বার সময় কোনও রকম প্রি-কন্ডিশন খাটে না। কিছুক্ষণ আগেই বলা হল না–বেশিরভাগ লেখা অন্যভাবে লেখা হয়ে থাকে! তাই তারও একটা চাপ আছে। চাপে এক ধরনের অভ্যাস তৈরি হয়ে যায়। চাপ কাটিয়ে ওঠা পাঠকের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। সময় সময়। আমি তো একা এভাবে লিখছি না–আরও অনেকে লিখছেন। কিন্তু আমাদের চাপটা কম বলেই এই ব্যাপারগুলো ঘটছে। যদি এভাবেই লেখা হত তবে তো একথা উঠতই না।

গল্পবিশ্ব : আপনি কীভাবে চান–পাঠকের কাছে নেমে এসে লিখতে, না পাঠককেই উঠে আসতে হবে আপনার কাছে?

পীযূষ : একটা জায়গায় নিশ্চয় পাঠক সমঝোতা করে নেয়, কেননা একজন লেখক একই রকমভাবে লিখে যাচ্ছে, কেন লিখছে জানবার কৌতূহল থাকবেই। এই জানা, নিজেকে লেখার মধ্যে খুঁজে পাওয়ার জন্য লেখা নিশ্চয় পড়া হচ্ছে। তা না হলে কোনও বই তো পড়ে থাকছে না। এই মুহূর্তেও বাজারে কোনও বই নেই। তবে আমার ক্ষেত্রে এই রসায়নটা খুউব দ্রুত হয়নি, এত ধীরে ধীরে হয়েছে যে, ধৈর্য রাখাটাই মুশকিল। আমার অবশ্য শোনা কথা 'জীবিসঞ্চার' উপন্যাসটি অনেকেই জেরক্স করে পড়েছেন। এই আর কি।

গল্পবিশ্ব : আপনি পাঠকের উদ্দেশ্যে যদি কোনও ভূমিকা লেখেন, সেখানে কি মেসেজ দেবেন?

পীযূষ : পাঠকদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলব, তাঁরা যেন সাংস্কৃতিক পরাধীনতা ত্যাগ করে পড়েন। অর্থাৎ ইউরোকেন্দ্রিকতা ছেঁটে দিয়ে পড়বার অনুরোধ রাখব।

গল্পবিশ্ব : যদিও আমাদের উপন্যাসগুলো বেশিরভাগই ইউরোপীয় মডেলের কিন্তু আপনার লেখাতে ল্যাটিন আমেরিকার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত–

পীযূষ : 'মনসামঙ্গল'-কে আমি উপন্যাস হিসাবে ট্রিট করি। একে ভাই কোন মডেলে ফেলবে? না ইউরোপীয় না ল্যাটিন আমেরিকান, কোনও মডেলে ফেলা যাচ্ছে কি? মনসামঙ্গল আমার মতন করে পড়ে বুঝেছি, প্রতিহিংসার কাহিনীর মধ্যে ঢুকে আছে অদ্ভুত জার্নি। বেহুলার লখিন্দরের শব নিয়ে যাত্রাটাই আমার কাছে প্রধান। মানুষের বেঁচে উঠবার ম্যাজিক যেন! এ তো আজ থেকে ছ'শ বছর আগের লেখা। একে তো আজ পর্যন্ত ল্যাটিন আমেরিকার ম্যাজিক রিয়ালিজিম বলতে শুনিনি কাউকে। যেখানে বসে কথা বলছি এই শিলিগুড়ি, উত্তরবঙ্গে–উত্তরবঙ্গে এই অঞ্চলে নদী-পাহাড় থেকে নেমে আসে নুড়ি সঙ্গে করে, সেই নুড়ি বালি হয়ে যাচ্ছে স্রোতের ঘর্ষণে।

ঘর্ষণের এই প্রক্রিয়া কিন্তু ইউরোপ বুঝবে না। যেমন বুঝবে না, আমি যেখানে থাকি, উত্তরবঙ্গের সমতল অঞ্চলে, বালুরঘাটে, সেখানে কিন্তু বালি, সেই বালিতে মিশে আছে অভ্রচূর্ণ, যা রোদে চিক চিক করে, জ্যোৎস্নায় ঝিক মিক আর অন্ধকারে মায়ার বিস্তার। আরও ডাউনে তো অন্য খেলা–নোনা জল মিশে যাচ্ছে মিষ্টি জলের সঙ্গে জোয়ারভাঁটায়। এ ভাবেই নদীকে আনতে চাই লেখাতে। সেখানে কার মতন হল আমার কাছে বড় নয় তা। আমার নদী আমার মতন করে লেখাতে আসছে কিনা সেটাই বড় কথা।

গল্পবিশ্ব : কুসংস্কার, অবাস্তব, অলৌকিক তা ইত্যাদি বিষয় কিন্তু আপনার লেখাতে আছে। আমরা কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকার লেখাতেও এসব বেশি দেখে থাকি। তা সত্ত্বেও কি বলবেন আপনার লেখা ল্যাটিন আমেরিকানদের মতন নয়?

পীযূষ : আবহমান কাল থেকে আমাদের মায়েরা সন্তানকে জন্ম দেবার পর থেকে তাকে রক্ষা করবার জন্য সচেষ্ট থাকেন। বাজারে দশকর্ম ভাণ্ডারে দেখবে পাঁচ চোখওয়ালা এক ধরনের বড় পুঁতি পাওয়া যায় সেগুলি সন্তানের কোমরে ঝুলিয়ে দেন। সেই সন্তানের নর্মাল ডেলিভারি হতে পারে, সিজারিয়ানও হতে পারে। আমার মনে হয় টেস্ট টিউব বেবিদের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি। মায়েদের এই সংস্কারের মধ্যে কোনও দোষ দেখি না–এ তো সব মায়েদের চাওয়া তার সন্তান যেন বেঁচে থাকে। কেউ কিন্তু পাঁচ চোখওয়ালা অপদেবতাকে চোখেই দেখেনি, তথাপি তাকে বশে রাখতে চায়। আমাকে তো ছোটবেলায় আমার মা নখ কেটে দিতেন দাঁত দিয়ে–এতে বিপদের কাটান হয় কিনা জানি না। শ্মশান থেকে তুমি ফিরে এলে নিমপাতা খাইয়ে দেবে তোমার বাড়ির লোক। এই সংস্কার নিয়েই একজন ব্যক্তি মানুষ, ব্যক্তি মানুষের চরিত্রের বিশেষ দিক বোঝাতে আমি বিশেষ বিশেষ সংস্কার জুড়ে দিয়েছি চরিত্রে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা সংস্কারের মধ্যেই আছি, সেখানে 'কু' শব্দটা ব্যবহার করবার দায়িত্ব আমার উপর বর্তায় না। আর অবাস্তবতা, বাঙালির মূল উৎসবের মূলেই তো ভীষণ অবাস্তবতা। যতই কায়দা করে বলি না কেন 'শারদ উৎসব' কেন্দ্রে কিন্তু রয়ে গেছে দশটি হাত নিয়ে এক নারীমূর্তি। দশ হাতের পৌরাণিক কাহিনীর খুউব কি কেউ গুরুত্ব দেয়? ধর্মে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন কিন্তু উঠছে না কখনও, উৎসবের গুরুত্ব কিন্তু অসীম। বাস্তবে যদি দশ হাত নিয়ে ম্যাজিকাল মহিলা আমাকে জড়িয়ে ধরতে চায় আমার তো প্রথমেই অক্টোপাসের কথা মনে পড়বে। তবে দশ হাতের অবাস্তবতা বা ম্যাজিক জুড়েই থাকছে জীবনের সঙ্গে। নতুন বছরের ক্যালেন্ডার দেওয়ালে টাঙানোর আগেই দেখি দুর্গাপুজো কবে। আমি তো মনে করি, জীবিত মানুষেরাই বেশি ভয় পায় মৃতকে। এই ভয় পাবার বিষয়টা হঠাৎ হঠাৎ আমার লেখাতে এসেছে। এই আসাটা যদি ল্যাটিন আমেরিকান হয়ে যায়, তাতে কিছু করবার নেই। কেননা আমরা ভারতীয়রা এরকমই। আর তুমি যে প্রশ্নটা করলে না তা হচ্ছে আমার লেখাতে

তন্ত্রও আছে।

গল্পবিশ্ব : মার্কেসের আগে ম্যাজিক রিয়ালিজিম এত সোচ্চার ছিল না–ম্যাজিক রিয়ালিজিম আপনাকে আকর্ষণ করে কিনা?

পীযূষ : মনসামঙ্গলের বেহুলার জার্নিটা বহুদিন আগেই টেনেছে। তখন পড়বার সময় মনে হয়নি এটাও এক ধরনের জাদু বাস্তবতা। এরপর মার্কেস পড়বার পর পেলাম ক্যারিবিয়ান বাস্তবতার অন্য রূপ। সেখানের বাস্তবতা তো বহুজাতিক সম্মিলনের ফল। তার ফলে বিভিন্ন মহাদেশের মানুষের লোকবিশ্বাসগুলি একসঙ্গে থাকতে থাকতে এক ধরনের বাস্তবতা তৈরি হয়েছে–যাকে মার্কেস বলছেন জাদু বাস্তবতা বা ম্যাজিক রিয়ালিজম। আমাদের সংস্কৃতিও বহুভাগে বিভক্ত তার রঙও বিভিন্ন। এখানে আছে বিভিন্ন স্বর। আমি শুধু জার্নির রুকস্যাকে এ সমস্ত কিছুই ভরে নিয়ে চলতে চাইছি। তাতে যদি বোঝা যায় জাদু বাস্তবতা আমাকে টেনেছে বা টানছে তাতে কিছু করবার নেই আমার। আর তুমি যদি বলো এগুলো জাদু বাস্তবতা হচ্ছে না তাতেও আমার কোনও যায় আসে না। আমি শুধু আমার লেখাটা লিখতে চাইছি। লেখা লেখক নিজের মতনই লেখেন। তত্ত্ব পিছন পিছন যায়। তত্ত্ব যদি প্রথম থেকেই লেখার ঘাড়ে চেপে যায় তবেই মুশকিল। প্রথমেই বলেছি, যে কোনও ধরনের লেবেল মারবার পদ্ধতিটা আমার পছন্দ নয়। আর মার্কেসের মতন আন্তর্জাতিক মানের লেখকরা এসব পারেন। তবে অনুবাদ সাহিত্য (ইংরাজিতে অবশ্যই), তার বাজারও ভাল এশিয়াতে। এশিয়ার পাঠকের কাছে যে কোনও ধরনের তত্ত্ব অনেকটা বিজ্ঞাপনের মতনই কাজ করে বলে মনে হয়। পাঠের মধ্য দিয়ে পাঠক নিজেকে আবিষ্কার করতে চান। মার্কেসের জাদু বাস্তবতায় হয়ত পাচ্ছেন তা। পাচ্ছেন বলেই জাদু বাস্তবতা শব্দটা বার বার উঠে আসছে।

গল্পবিশ্ব : যৌনতা, সাহিত্যে যৌনতা সম্পর্কে আপনার অভিমত?

পীযূষ : যৌনতা একটা বিষয়, তবে প্রধান বিষয় নয়। যেহেতু যৌনতা part of the life সেহেতু সাহিত্যে আসা উচিত। যদি লেখাটা চায় তবে খোলামেলা হলেও আপত্তি থাকবার কথা নয়। যৌনতা সম্পর্কে সেই পুরানো কথাটাই বলছি–এটা হচ্ছে অনেকটা তারের উপর দিয়ে হাঁটা। আমি শুধু যোগ করতে চাই ব্যালেন্স করবার জন্য হাতে বাঁশ বা ছাতা নেই। লেখককে ব্যালেন্স করতে হয় ছয় ইঞ্চির কলম দিয়ে। আমি এতদিন সাজেসটিভ যৌনতা ব্যবহার করেছি লেখাতে। উদাহরণ কিন্তু নিজের লেখা থেকেই দিচ্ছি–রেপ বোঝাতে লিখেছি '....কিন্তু সাটুর বিরাট হাতের চেটোতে মুখবন্ধ নিঃশ্বাস পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বুকের ভিতর আটকে যাচ্ছিল। আর কিছু মনে নেই।' আর একটা গল্পে রেপ নয় অন্য কিছু বোঝাতে লিখেছিলাম 'মুখে হাতচাপা দেবার দরকারই ছিল না কেননা তারপর থেকে তারা একসঙ্গে থাকে।' এসব বোঝাতে পাতার পর পাতা ব্যবহার করিনি–স্রেফ এক লাইনেই কাজটা করেছি। যেমন গল্পবিশ্বে 'কুয়াশার

ভিতর মাংসের উৎসব'-এ অসহায় যৌনতা বোঝাতে Allegory, Metaphor-এর সাহায্য নিয়েছি। যৌনরহস্য বলে যেটা আছে তা কিন্তু খুবই পবিত্র, জীবন শুরুর রহস্যও কিন্তু এখান থেকেই শুরু।

গল্পবিশ্ব : আপনার মৃত্যু চেতনা–আপনার লেখাতে কীভাবে থাকে?

পীযূষ : মৃত্যু নিয়ে মরবিডিতে আমার বিশ্বাস নেই প্রথমেই বলে রাখছি। ষাট বছর বয়স হয়ে গেল এখন যে কটা দিন আছি extention-এ আছি। তাই মৃত্যু কিছুটা প্রশান্তির রূপ নিয়ে ধরা দিচ্ছে। অনেকটা হাতিদের মতন। নির্দিষ্ট হাতিটি যখন বুঝে যায় সময় এসে গেছে প্রথমে সে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জন স্থানে চলে যায়, তারপর ধীরে ধীরে মাটিতে শুয়ে পড়ে। একে তুমি ব্যক্তিগত মৃত্যুকাঙ্ক্ষা বলতে পার। লিখতে বসে যে কথাটা মনে বিশেষ করে মৃত্যু সম্পর্কে হয় তা হচ্ছে আমার মা যদি আমাকে জন্মাতে সাহায্য না করতেন তবে তো মাতৃগর্ভেই আমার মৃত্যু ঘটে যেত। আর যদি লাথি মেরে বেরিয়ে আসতাম তবে মায়ের মৃত্যু ঘটাতাম। জন্মক্ষণ থেকে মৃত্যু জড়িত। তাই তুমি কী হবে এসব ঠিক থাকে না, তবে মৃত্যু যে হবেই তা কিন্তু জন্মক্ষণ থেকেই নিশ্চিত করা হয়ে যায়। প্রতি মূহূর্তেই অনিশ্চিত মৃত্যুক্ষণটি জীবনের সঙ্গে জুড়ে যায়। তাই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নটরাজের নৃত্যছন্দের মতন মৃত্যুছন্দ লেখাতে আসছে। কেননা নটরাজের চুলে বাঁধা মুণ্ড আর নবচাঁদ। নবচাঁদ পূর্ণচাঁদে চলে যাওয়াটাই জীবন। সঙ্গে থেকেই যাচ্ছে মুণ্ডমালা। যা কী না মৃত্যু। জন্ম-মৃত্যু একই বিন্দুতে থাকা সত্ত্বেও গড়িয়ে যায় আগামী সময়ের দিকে– এই এগিয়ে যাওয়াটাই লেখাতে আনতে চাই।

গল্পবিশ্ব : এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না আপনার গল্পে কোনও নারী চরিত্র প্রধান হয়ে উঠেছে আর সেই নারীর চোখ দিয়ে সমস্ত গল্পটা লিখেছেন?

পীযূষ : নারী চরিত্রই প্রধান এমন গল্প আছে, যেহেতু বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি তাই নারী চরিত্র বা কোনও চরিত্রই আর প্রধান থাকে না। একটি মাত্র গল্পে চেষ্টা করেছিলাম নারীর চোখ দিয়ে গল্পটা বলতে। পারিনি। 'পচন প্রক্রিয়া' গল্পটি শেষ পর্যন্ত যেভাবে গল্প লিখি সেভাবেই লিখেছি। ঋতুচক্র থেকে শুরু করে নারীদের সব কিছুই নিজের ভেতর থেকেই হয় তাই নারীর চোখ দিয়ে দেখতে গিয়ে আমার নিজস্ব sex আরোপ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে বলেই হয়ত পারিনি। তার উপর গল্পের মহিলা চরিত্রটি ছিল মুসলিম, পরে হিন্দু হয়েছে, ফেলা আসা ধর্মের প্রতি শিকড়ের টান কিছুতেই আনা যাচ্ছিল না। এ ধরনের লেখা লিখতে গেলে মনে হয় নিজের sexual identity-কে প্রাধান্য না দিয়ে লিখতে হবে। এটা কিন্তু আমার ধারণা। আগামী উপন্যাসে অন্তত একটা চরিত্র এভাবে লিখবার চেষ্টা করব। সম্ভব কিনা জানি না–চেষ্টা করতে আপত্তি কি?

গল্পবিশ্ব : এছাড়া আপনার গল্পে নারী চরিত্ররা কীভাবে থাকে?

পীযূষ : গল্পের নারী, আর বাস্তবের নারী এ দুটিই এক হয়ে যায় অনেক সময়। মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া। আমার ছেলেবেলাটা বিশেষ করে নীলফামারিতে এমন একটা পরিবেশের মধ্য দিয়ে কেটেছে তা হল আমার মা ও জ্যেঠিমার নিত্য ঝগড়া। একবার শুরু হলে থামতেই চাইত না, তখন এমন এমন ভাষা শুনতে পেতাম তাতেই একটা ধারণায় আসতে সাহায্য করেছে নারীরাই নারীর প্রথম শত্রু। তখনও মনে আছে যেসব যৌন উত্তেজক শব্দ ব্যবহার করতেন তার সবটা না বোঝা সত্ত্বেও কেমন যেন শরীরের মধ্যে অসোয়াস্তি হত। এই ফিলিংটা লিখবার সময় আজও কাজ করে। আমাদের দুটি কন্যা সন্তান। দ্বিতীয়টি হবার পর আমার স্ত্রীর মন খারাপ হয়েছিল। ফ্রয়েডিয়ান বা পুরুষতান্ত্রিক ভাবনা থেকে এই মন খারাপ নয়–এক অদ্ভুত ভাবনা পেয়ে বসেছিল–তার নাকি মুক্তি ঘটবে না, অশরীরী হয়ে থেকে যেতে হবে। মৃত্যুর পর পিণ্ডদান করবে কে? এটা তো আবহমানকালের সংস্কার, কীভাবে কাটবে জানি না, তবে আপাতত তিনি দুই কন্যার ঘরে নাতি নাতনীতে মশগুল। ঐ যে বললাম মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা, পৃথিবীতে ফিরে না আসতে চাওয়া থেকে যায় অবচেতনে। আমার মনে হয় বেঁচে থাকবার রিয়েলিটি থেকে এই বোধ জন্ম হয়। যেহেতু নারীরা আমাদের দেশে স্বনির্ভর নয় বলেই এরকম। শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যেও এই বোধের পরিচয় ধরা পড়েছে। বেশ কিছু দিন থেকেই এক মহিলাকে দেখছি, তিনি মাঝেমধ্যেই তার ছেলের কাছে টাকা দাবি করেন। ছেলেটির উপার্জন খুবই কম। কিন্তু সেই মহিলা নিজে যথেষ্ট উপার্জন করেন তা সত্ত্বেও তার দাবি দশ মাস দশ দিনের জন্য 'গুদাম ভাড়া' দিতে হবে। 'গুদাম' শব্দটা আমাকে হন্ট করেছে। তার জন্য কয়েকটি প্রশ্নও উঠে এসেছে মনে। তবে কি মহিলার গর্ভধারণের কোনও আকাঙ্ক্ষাই ছিল না? ছিল না কোনও আনন্দঘন মুহূর্ত? মা ও ছেলের সম্পর্কটা এরকম অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে না? কিছু নারী-পুরুষ আছেন কিছুতেই সম্পর্ককে স্বাভাবিক থাকতে দিচ্ছে না আজকাল। আমি শুধু অন্তর্নিহিত কারণ বুঝতে চেষ্টা করছি লিখবার জন্য। সৃষ্টিহীন দাম্পত্য জীবনই বা অনেক নারী আজকাল চাইছে কেন? এসবই আমার গল্পে-উপন্যাসে নারীদের সম্পর্কে কথা বা জিজ্ঞাসা। যেমন আমি বিশ্বাস করি কোনও নারীকে ধর্ষণ করবার চেয়ে খুন করে দেওয়া ভাল। ভাবতে পারি খুন করবার সময় খুনী হয়ত মুহূর্তের জন্য নারীর সৃষ্টির ভূমিকা ভুলে গিয়েছিল বলেই খুন করা। ধর্ষণ তো সৃষ্টির ভূমিকাকে অস্বীকার করা। যেমন ম্যাজিক শো-তে হয়, একজন নারী এসে স্টেজে দাঁড়াল, তারা রূপ আকর্ষণ করল। সেই নারীকে যখন ম্যাজিসিয়ান করাত দিয়ে দু ভাগ করে দেবার খেলা দেখাল, আঁতকে উঠতেই হয়। আবার জোড়া লাগিয়ে দেওয়া হল দু খণ্ডে, নারী আবার স্বাভাবিক, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাত নেড়ে পর্দার ওপারে চলে যাচ্ছে। হাততালি দিয়ে যাচ্ছি। জানি না পর্দার আড়ালে সে কেমন আছে। হাততালি দেওয়াটাও লেখা, না জানাটিও লেখাতে থাকে।

গল্পবিশ্ব : সাহিত্য সমালোচনা আপনাকে কি প্রভাবিত করে?

পীযূষ : আমাদের আলোচনায় বারবার মার্কেসের নাম উঠে এসেছে তাই শুরুটা করা যাক তাকে নিয়েই। মার্কেস তার প্রথম উপন্যাসটি লিখবার পর এক সাহিত্য সমালোচককে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছিলেন পড়ে মতামত জানানোর জন্য। সমালোচকের পড়ে মনে হয়েছিল কাব্যিক উপাদান ছাড়া লেখাতে কিছু নেই, উপরন্তু লেখা ছেড়ে অন্য কিছু করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। মার্কেস সমালোচকের কথায় কান দেননি, ভাগ্যিস। জীবনানন্দ থেকে শুরু করে এরকম বহু উদাহরণ আছে। আলোচনা যদিও বা বোঝা যায় কিন্তু সমালোচনা বলে যা হয় তা সত্যিই বুঝে উঠতে পারি না। তাই ধারণা খুবই অস্পষ্ট, সমালোচকদের সম্পর্কে। যেমন ধর, আমার প্রথম বই 'কুশপুত্তলিকা' বের হবার পর দু-তিনটি সংবাদপত্রের পাতার সিকিভাগ জায়গা জুড়ে সমালোচনা হল, তারপর সব চুপ। কিন্তু এই চুপ হয়ে যাবার অর্থ কিন্তু অন্যরকম। যে পাঠকের প্রথম বইয়ের সমালোচনাটা পড়া আছে তার মনে হতেই পারে এর পর যা লিখেছি সেগুলি কোনও লেখাই হয়নি। এসব হলে সমালোচনার গুরুত্বই হারায়। তবে এ বিষয়ে একটি প্রচলিত পদ্ধতির কথা শোনা যায়, বিশেষ করে সংবাদপত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে, তা হচ্ছে তুমি বা প্রকাশক প্রথমে বইটি জমা দেবে, তার আগে ঠিক করে নেবে কাকে দিয়ে আলোচনা করালে ভাল হয় এবং তাকে দিয়েই যেন সংবাদপত্রগুলি করায় তার ব্যবস্থা করা। তারপর সমালোচকের সঙ্গে লিয়াজোঁ মেনটেন করে লেখাটা লিখিয়ে নেওয়া। তুমিই বলো কোন লেখকের পক্ষে করা সম্ভব তা! তার উপর বিশেষ বিশেষ সমালোচকদের নিজস্ব লেখক তালিকা আছে তার বাইরে তাঁরা খুউব একটা যান না। এমনও সমালোচনা পড়েছি সেখানে তারাশঙ্কর, মানিক, সমরেশ বসু, মহাশ্বেতা দেবীর উত্তরসূরী খুঁজবার এক ধরনের চেষ্টা করা হয়। এতে লেখকের কী হয় জানি না–তবে লেখাটার বারোটা বেজে যায়। সমালোচনা পড়ে যদি পাঠক লেখাটা পড়েন তবে তার পঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে উত্তরসূরীর সঙ্গে বর্তমান লেখকের কতটা মিল তা খুঁজবার চেষ্টা কাজ করায় সেই লেখাটা ঠিকঠাক পড়াই হয়ে ওঠে না। তবে আমাদের এখানে সমালোচনা পড়ে সাহিত্য পাঠের অভ্যাস গড়ে না ওঠায় একদিক থেকে বাঁচা গেছে। বিশেষ করে লেখকের সৃষ্ট চরিত্রগুলো অপমানের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। বিশেষ বিশেষ সমালোচকের মন্তব্য বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান নাকি গুরুত্ব দিয়ে থাকে–আমি বলব এ হচ্ছে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রোটোকল। তবে, সংবাদপত্রে সমালোচনা বের হলে এক ধরনের বিজ্ঞাপন তো হয়ই।

গল্পবিশ্ব : সমালোচকদের দশকওয়ারি লেখকদের শনাক্তকরণ কি ঠিক?

পীযূষ : লেখকদের দশকওয়ারি ভাগ করার অঙ্কটা বেশ জটিল কিন্তু বাজারে বেশ চালু। আমি তো বুঝেই উঠতে পারি না শুরুর সূচকটা কি? ধরা যাক একজন লেখক তার স্কুল জীবনে স্কুল ম্যাগাজিনে গল্প লিখেছিলেন তার পর কুড়ি বছরে কিছুই লেখেননি।

তাকে কোন দশকে ফেলা যাবে। লেখাটা মাঝখানের কুড়িটা বছর কিন্তু তার মধ্যে থেকে গিয়েছিল। এরকম বহু লেখক আছেন জেলার কাগজগুলোতে অনেক দিন লিখছেন কিন্তু কলকাতার কাগজে লেখা ছাপা হল অনেক দিন পরে। তাদের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় জুটে যায় কলকাতায় প্রকাশিত লেখাটির সময়কাল। এটা কিন্তু সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ভাবনার বাইরে চিন্তা। লেখাটাকে টোটাল জীবনের কাজ হিসাবেই আমি দেখি–কে কখন শুরু করল কে কখন থেমে গেল তার হিসাব রাখতেই চাই না। যদি হিসাব রাখতে হত তবে তো আমার ধারণার মধ্যেই ঢুকে যেত সত্তরের দশকের পর কোনও লেখালেখিই হয়নি। কেননা সাহিত্য সমালোচনার সিংহভাগ সত্তরের দশক পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর দশকের ভাগটা সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলা ভাষার লেখকের জন্য নয় কেবলমাত্র কলকাতা বা তার আশপাশ অঞ্চলের জন্য।

গল্পবিশ্ব : ব্যতিক্রম কি নেই?

পীযূষ : নিশ্চয় আছে, তা না হলে আমার বা আমাদের লেখা খুউব কম হলেও তো আলোচনা বা সমালোচনা হয়। তবে হাতে গোনা দু-তিন জনমাত্র তাঁরা। তাই বলে ভাববার কোনও অবকাশই নেই সমালোচনা সম্পর্কে আমার মত পাল্টাচ্ছি। ওঁরা আমাদের লেখা আনছেন একেবারে সময়ের তাগিদে। সবসময় মনে রাখতে হবে সময়ের একটা নিজস্ব চাপ থেকেই যায় যে কোন ধরনের লেখালেখিতে। আমার 'ঠাকুমার তালপাতা' বইটি দিবারাত্রির কাব্যে আলোচনা করতে গিয়ে নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন '... সঠিকভাবে বলতে হয় যথেষ্ট মনোযোগ সহকারে পড়া হয়নি সমালোচকদেরও।' যেহেতু নীলাঞ্জন মূলত লেখক–লেখক বলেই ঝুঁকি নিয়ে বলতে পেরেছেন। কেননা লেখকই ঝুঁকি নিতে পারেন।

গল্পবিশ্ব : আপনি নিজে কি সমালোচনা করবেন?

পীযূষ : একাজটা আমার নয়, তবে সমালোচনা বা ক্রিটিসিজিম শব্দ দুটি তুলেও দিতে পারব না। কোনও কোনও সময়ে কোনও গল্প-উপন্যাস পড়ে ভাল লাগলে, বলি, এ বলা কিন্তু সোচ্চারেই বলা। কোনও রকম হিপোক্রেসিতে আমি নেই–কেননা হিপোক্রেসি লেখার ভীষণ ক্ষতি করে। পড়ার পর বুঝে নিতে চাই লেখক যে কোনও সময় বাঁক নেবার ক্ষমতা রাখে কী না। যদি মনে হয় লেখক ক্ষমতা রাখে তবেই বলি। এই যে শুভঙ্কর গুহর লেখা ভাষাবন্ধনে পড়লাম–'স্থিরচিত্র বা বায়োডাটা বিষয়ক' নাম গল্পটির। আমি গল্পটির বিষয় বৈচিত্র্য ভুলতেই পারছি না। যদি তোমার লেখা 'শূন্যপূরাণ' গল্পটির কথা এখন বলি তবে তো কারও কারও ব্যাকরণ বহির্ভূত বাক্যও শুনতে হবে। সত্যের প্রতি এক ধরনের মান্যতা আছে বলেই আমাকে বলতেই হচ্ছে শূন্যপুরাণের বন্ধ চা বাগানে মেটাফিকশন এখনও আমার মধ্যে ক্রিয়াশীল। এগুলো সমালোচনা নয়–আলাপচারিতা। ভাব বিনিময়। এসব করেই থাকি।

গল্পবিশ্ব : বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিকদের বিভিন্ন শিবিরে ভাগ হয়ে

যাওয়ায় আপনার কি কোনও ভূমিকা আছে? একজন সাহিত্যিক হিসাবে?

পীযূষ : একদম পয়েন্টেড প্রশ্ন, নন্দীগ্রাম তো?

গল্পবিশ্ব : হ্যাঁ।

পীযূষ : নন্দীগ্রামের বিষয়টা এসেছে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। তার মধ্যে ১৪ জন একসঙ্গে মারা গেলেন। বলা ভাল মৃত্যু ঘটল হল পুলিশের গুলি সহ অন্য ধরনের গুলিতে। পরিষ্কারই বলছি এটা খুবই নিন্দনীয় ঘটনা। এরকম ঘটনাকে সমর্থন করব এটা ভাববার কোনও কারণ নেই। এর প্রতিবাদও করেছি কথাসাহিত্যিক হিসাবে। তবে একথাও বলেছি এ ঘটনা ঘটাবার প্রক্রিয়ার মধ্যে যারা আছে, সে যে কোনও দল হোক না কেন, তারাও সমান নিন্দনীয়। কোনও রকম দ্বিমত নেই পুলিশের কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণের, ওরা চিরকালই ওরকম, তা না হলে কী করে থানা লক-আপে বিচারাধীন বন্দিকে একলা পেয়ে হত্যা করতে পারে! এই হত্যার সংখ্যা কিন্তু কম নয়। আবার উচ্ছেদের আগেই উচ্ছেদের প্রক্রিয়ার ঘটনাটিও সমান নিন্দনীয়। আবার দেখবে সে সময়ে সংবাদপত্র–সংবাদ মাধ্যম মৃতের সংখ্যাকে বাড়াতে বাড়াতে এমন এক সংখ্যায় নিয়ে গিয়েছিল তাতে বোঝা যাচ্ছিল সংবাদ মাধ্যমও একটি রাজনৈতিক পক্ষ নিয়ে ফেলেছে। কেননা ঘটনা অতিরঞ্জনও এক ধরনের রাজনীতি। আমি কিন্তু এই অতিরঞ্জনের বিরুদ্ধে কোনও বুদ্ধিজীবীর প্রতিবাদ দেখিনি বা শুনিনি।

গল্পবিশ্ব : প্রতিবাদ থেকে বলা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে এমনই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলছে যে পশ্চিমবঙ্গ বসবাসের যোগ্যই নয়?

পীযূষ : আগেই বলেছি বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক দিশা থাকতেই পারে। তারা প্রতিবাদ করতেই পারেন। প্রতিবাদ তো চলছেই। কৈ শুনিনি তো মাইকের তার কেটে দেওয়ার কথা। লেখাও হচ্ছে, টিভিতে মুখ দেখানোও হচ্ছে। বুদ্ধিজীবীরা ভাল করেই জানেন কোনটা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস কোনটা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নয়। এই সময়ের সমস্ত 'ডিবেটের' বিষয়গুলো নিয়ে 'ডুয়েলে' চলে যাওয়াটাতে আমার ধন্দ আছে–কেননা সমস্তটাই শেষপর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে বুদ্ধিজীবিকায়! শোনও ভাই, এই সব রাজনৈতিক হতার আমি ঘোর বিরোধী, এই বয়সে পৌঁছে বুঝেছি এই হত্যাগুলো অনুপাতে সমান না হওয়া পর্যন্ত থামতেই চায় না, যখন ১ঃ১, ২ঃ২ হয়ে যায় তখন হঠাৎই থেমেও যায়। এই যে সেদিন বিপ্লবের নামে নরবলি হয়ে গেল–একে কী বলবে তুমি? নিপীড়িত মানুষের পক্ষে দাঁড়ানোটাই নিয়তি লেখকের। আর লেখকের কাছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস? এই মুহূর্তে কোনও দেশের ঘটনা মনে পড়ছে না–লেখকের সমস্ত পাণ্ডুলিপি পুলিশ-মিলিটারি নিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করছে কতক্ষণে লেখক আত্মহত্যা করবে তার জন্য। ভাবলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে!

গল্পবিশ্ব : আপনি তো ষাট বছরে পৌঁছে গেলেন। এতদিন আপনার যা লেখা

পড়েছি তার মধ্যে আপনার জীবন বোধ ধরা পড়েছে। তা তো শিল্পের শর্ত মেনেই এসেছে। আমি চাইছি আপনার জীবন সম্পর্কে একটি ধারণা তাতে কোনও শর্তই থাকবে না। আপনার জীবনের একটা সাম-আপ, নিজেকে কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে বলবেন।

পীযূষ : বুঝলে আলোক, এখন আমার কেন যেন মনে হয় আয়নার প্রতিবিম্বও মিথ্যাচার করে। আর মধ্যবিত্তের মুখোশটাকে খুলে ফেলতেই পারব তার কোনও গ্যারান্টি নেই। বহু দিনের ব্যবহারে মুখোশ সেঁটে যায়–এ বড় কঠিন ব্যাপার। সব মানুষকে একদিন না একদিন নিজের মুখোমুখি দাঁড়াতেই হয়–আমাকেও দাঁড়াতে হবে। তার আগে না হয় একটা ট্রায়াল হয়ে গেল–

গল্পবিশ্ব : আপনার জীবনে প্রেম?

পীযূষ : প্রেম অনেক বড় ব্যাপার। কেননা দু'জনকেই ভাবতে হয় জীবন আমারই, এর জন্য যে ধরনের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে রাজি এবং যদি প্রয়োজন হয় সমাজের উর্ধ্বে উঠতে হয়। বয়সকালে এ ধারণার মধ্যে অনেক কিছুই ঢুকিয়ে দিয়েছিল সমাজ, তার মধ্যে ছিল এক ধরনের হিসাব-নিকাশ, তা অর্থনৈতিক হতে পারে, হতে পারে সামাজিক শাসন বা পারিবারিক ধারা। এসব কিছুর উর্ধ্বে আমি নিজে উঠতে পারিনি বলেই বলি, ভালবাসা ও ভালবাসা। প্রেম নয়।

সেই অর্থে আমি কোনও ঠিকঠাক শৈশব, কৈশর পাইনি। ক্লাস থ্রি-ফোর পড়ার বয়স পর্যন্ত স্কুলে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। সেই সময় কলকাতা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের রংপুরের নীলফামারিতে চলে যাই। তখন যা বয়স মেয়েদের সঙ্গে দাড়িয়াবান্ধা খেলবার সময় মেয়েদের বুকে হাত দিয়ে আউট করতে পারলে নিজেকে পুরুষ বলে মনে হত। সেই বয়সে ফুরফুরি নামে একটি মুসলিম মেয়েকে ভাল লাগত। কিন্তু ১৯৫৮-তে বালুরঘাটে চলে আসার পর ১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আবার একবার দেখা হয় ফুরফুরির সঙ্গে। সেই সময়টাতে রিফিউজি ক্যাম্পে নানান কাজ করতাম। তার একটাই উদ্দেশ্য রাজনৈতিকভাবে মৌলনা ভাসানির ন্যাপের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। ন্যাপের একটা গোপন খবর পৌঁছে দেবার জন্য জলপাইগুড়িতে আসি। নির্দিষ্ট বাড়ির দরজা যে খুলে দেয় সে সেই ফুরফুরি। এবং মুহূর্তের মধ্যে জমে বরফ হয়ে গেল সে। সেই প্রথম ও শেষ বরফের মানুষ দেখা। শুধু একটা মাত্র প্রশ্ন করেছিলাম–'কেমন আছ'। উত্তরে ফুরফুরি শুধু বলেছিল 'তালাক হয়ে গেছে।' ফুরফুরিদের পরিবারটি ন্যাপের সমর্থক বলেই এই তালাক। কোনও উত্তর না দিয়ে চলে এসেছি। চব্বিশ বছরের যুবক এবং বিবাহিত তখন আমি।

যখন ক্লাস নাইনে পড়ি তখন ক্লাস এইটের একটি মেয়েকে ভাল লাগে। কিন্তু ক্লাস নাইনের রেজাল্ট নিতে গিয়ে জানতে পারি গত দু'বছর থেকে যে স্টাইপেন্ডটা পেতাম তা বন্ধ। দু'বছরের মাইনে দেওয়া হয়নি বলে রেজাল্ট উইথ্‌হেল্ড; পাশ না ফেল

হেডসারের কাছে জানতে চাইলে তিনি বললেন 'প্রাইভেটে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে দে।' তিনিই প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। থার্ড ডিভিশন হয়েছিল, প্রাইভেটে ৭% থেকে ১৩% হত তখন। মেয়েটি পড়াশোনায় ভাল ছিল, পারিবারিক স্ট্যাটাসেও আমাদের সঙ্গে মিল নেই, আর ততদিনে আমি কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে চলে আসায় ওদের সম্পর্কে একটা শ্রেণী বৈষম্যের ভাব তৈরি হবার ফলে দূরত্ব হয়ে যায়। তারপর কলকাতায় পড়তে চলে যায়, পড়া শেষ হলে অধ্যাপনা, ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বিয়ে ইত্যাদিও ঘটে যায় কখন, বুঝতেই পারিনি। হঠাৎ হঠাৎ বালুরঘাটে যখন আসত তখন দেখা হয়ে গেলে ভাবতাম ও নিশ্চয় আমাকে অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছে। একদিন শুনি ওর বিয়েটা ভেঙ্গে গেছে; এবং বিদেশে চলে গেছে। শুনে মনটা খারাপ হয়েছিল। কিন্তু প্রয়াত বন্ধু প্রমার সম্পাদক সুরজিৎ জানাল ব্যক্তিগত কলমে 'পচন প্রক্রিয়া' পড়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছে বিদেশ থেকে একটা মেয়ে। সে মেয়ে যে আমার ক্লাস নাইনের ভাল লাগা মেয়ে তা জানতাম না। 'নিরক্ষরেখার বাইরে' পড়ে একদিন বাড়িতে ফোন করে সুরজিৎই ফোন নম্বর দিয়েছিল। তখন জানতে পারলাম। ওর আই এস ডি নম্বরটাও দিয়েছিল কিন্তু তা ব্যবহার করতে পারিনি। তুমি কিন্তু লক্ষ্য করে দেখবে প্রমার পুজো সংখ্যাতে আমি লিখতামই যতদিন সুরজিৎ বেঁচে ছিল। তারপর একটা ফোন। বহু দিন হয় কোনও ফোন নেই–প্রমাও বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু মাঝে মাঝে মনে হয় বেঁচে আছে তো!

আমার বিয়ে কিন্তু সামাজিক প্রথা মেনে। বিয়ের আগে আমরা দু'জনের সামনাসামনি দেখা তো দূরের কথা কোনও পরিচয়ই ছিল না। বেশ কয়েক বছর আগের তোলা গ্রুপ ফটোতে দেখেছি–তার কাছে পাঠানো হয়েছিল স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবার প্রয়োজনে তোলা আমার পাসপোর্ট ফটো। এরকম বিয়ে কিন্তু ইউরোপীয় ধারণায় এক ধরনের ব্যভিচার। আমার কিন্তু অন্য ধারণা, এ রকমভাবে বিয়ে করবার ফলে। বিয়েটা ব্যবস্থা করেছিল আমাদের পরিবার, সমাজ। কিন্তু শুভদৃষ্টির সময় চোখে চোখ পড়বার পর সৃষ্টি হয়েছিল ভালবাসার। তা হচ্ছে পারিবারিক সীমার বাইরে সামাজিক সীমার উর্ধ্বে এক ভাল লাগা মূল্যবোধ। ঠিক বলে বোঝানো যাবে না তা। যেদিন তাকে সঙ্গে নিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিলাম–আগুনের ভিতর জ্বলে-পুড়ে মরতে বসলাম সেদিনই বুঝেছিলাম এই মরণও 'তুঁহু মম শ্যাম সমান।' সেই মুহূর্তটাই আমার সব চেয়ে ভাল লাগার মুহূর্ত। ভালবাসার শুরুও বলতে পার। প্রেম যে কী বুঝে উঠবার মুহূর্তও বুঝি সেই সময়ই।

আমার স্ত্রী, মাধুরীই আমার ভালবাসার নারী। ভাল লাগার নারীরা কিন্তু এখনও আছেন– কেননা ভাল লাগা বোধটা আজও আছে।

গল্পবিশ্ব : কবিতা এখনও পড়েন?

পীযূষ : সাধারণত দীর্ঘ কবিতা পড়তে পছন্দ কবি। একসময় অমিতাভ গুপ্তর

'বুলন্দ দরওজা' মুখস্থ বলতে পারতাম।

গল্পবিশ্ব : বাংলা ভাষার প্রিয় কবি কে?

পীযূষ : যেহেতু অনেক কবিতা পড়ি সেহেতু প্রিয় কবি বাছাই করা আমার পক্ষে মুশকিল। পছন্দের কবিরা জীবনানন্দ দাশ, সিদ্ধেশ্বর সেন, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, মণিভূষণ আচার্য, অমিতাভ গুপ্ত, বীতশোক ভট্টাচার্য, এরকম অনেক কবিই আছেন পছন্দের তালিকায়।

গল্পবিশ্ব : সঙ্গীত?

পীযূষ : সাধারণত যন্ত্রসঙ্গীতই আমার পছন্দ। অর্কেস্ট্রা নয়, সোলো। তার মধ্যে বেশি পছন্দ নিখিল ব্যানার্জির সেতার। বর্ষার উপর যে কোনও রাগই আমার ভাল লাগে বেশি।

গল্পবিশ্ব : ছবি?

পীযূষ : সালভাদর দালি, যদিও ছাপাইয়ের মাধ্যমে দেখা। ওয়াসিম কাপুরের ছবির প্রদর্শনী দেখেছি।

গল্পবিশ্ব : চলচ্চিত্র?

পীযূষ : ঋত্বিক ঘটকের মেঘে ঢাকা তারা

গল্পবিশ্ব : সব চেয়ে কীসের জন্য বেশি আপশোস হয়?

পীযূষ : ছবি আঁকাটা চালাতে পারিনি বলে।

গল্পবিশ্ব : সব চেয়ে পছন্দের মানুষ?

পীযূষ : এ তালিকাটি দীর্ঘ কিন্তু প্রথমেই আছেন আমার স্ত্রী মাধুরী।

গল্পবিশ্ব : সব চেয়ে অপছন্দের মানুষ?

পীযূষ : যে সব মানুষ জীবনানন্দ দাশের 'অপরের মুখ ম্লান ক'রে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ/ নেই।' লাইনটার তাৎপর্য বোঝে না, তাদের।

গল্পবিশ্ব : কোনও মানুষকে হিংসা করেন?

পীযূষ : যাদের স্মৃতিশক্তি ভীষণ প্রখর যে কোনও রেফারেন্স মুখস্থ বলতে পারেন যখন তখন। তাদের।

গল্পবিশ্ব :প্রিয় ভাবনা?

পীযূষ : যে উপন্যাস লিখতে পারব না তা নিয়েই চিন্তা করা।

গল্পবিশ্ব : প্রিয় পড়বার বিষয়?

পীযূষ : সে রকম নির্দিষ্ট কিছু নেই। তবে এই মুহূর্তে আগামী উপন্যাসের জন্য The Sphinx Speaks Or The Story Of Prehistoric Nation পড়ছি। পড়ে, ঠিক মতন বুঝে উঠতে পারছি না জায়গায় জায়গায়। একজন শিক্ষক দরকার। শিক্ষক রেখে এর আগেও কিছু বই পড়েছি। সেই সব শিক্ষকেরা বয়সে তরুণ। তরুণদের কাছে আমি ভাল শিখি। ■

Space donated by

MAA TARA CONSTRUCTION

govt. contractor
Chakbhringu, Balurghat
Dakshin Dinajpur

Space donated by

A WELL WISHER